সাহিত্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য ৷৵০ আনা।

সূচী।

সাহিত্য।

সাহিত্যের তাৎপর্য্য।

বাহিবের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ কবিয়া আব একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিবের জগতের রং, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে, তাহা নহে—তাহার সঙ্গে আমাদেব ভাললাগা-মন্দলাগা, আমাদেব ভয়-বিস্ময়, আমাদেব সুখ-দুঃখ জড়িত—তাহা আমাদেব হৃদয়বৃত্তিব বিচিত্র বসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

এই হৃদয়বৃত্তির রসে জাবিয়া-তুলিয়া আমবা বাহিবের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার কবিয়া লই।

যেমন জঠরে জাবকবস অনেকেব পর্য্যাপ্তপরিমাণে না থাকাতে বাহিরের খাদ্যকে তাহারা ভাল করিয়া আপনার শরীরের জিনিষ করিয়া লইতে পারে না—তেম্নি হৃদয়বৃত্তিব জারকরস যাহাবা পর্য্যাপ্তরূপে জগতে প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহারা বাহিরের জগৎটাকে অন্তবের জগৎ, আপনার জগৎ, মানুষের জগৎ করিয়া লইতে পাবে না।

এক-একটি জড়প্রকৃতি লোক আছে, জগতের খুব অল্প বিষয়েই যাহাদের হৃদয়ের ঔৎসুক্য—তাহারা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধিকাংশ জগৎ হইতে বঞ্চিত। তাহাদের হৃদয়ের গবাক্ষগুলি সংখ্যায় অল্প এবং বিস্তৃতিতে সঙ্কীর্ণ বলিয়া বিশ্বের মাঝখানে তাহারা প্রবাসী হইয়া আছে।

এমন সৌভাগ্যবান্ লোকও আছেন, যাঁহাদের বিস্ময়, প্রেম এবং কল্পনা সর্ব্বত্র সজাগ—প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ; লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাঁহাদের চিত্তবীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে।

বাহিরের বিশ্ব ইঁহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রংয়ে, নানা ছাঁচে নানারকম করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে।

ভাবুকের মনের এই জগৎটি বাহিরের জগতের চেয়ে মানুষের বেশি আপনার। তাহা হৃদয়ের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের পক্ষে বেশি সুগম হইয়া উঠে। তাহা আমাদের চিত্তের প্রভাবে যে বিশেষত্ব লাভ করে, তাহাই মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়।

অতএব দেখা যাইতেছে বাহিরের জগতের সঙ্গে মানবের জগতের প্রভেদ আছে। কোন্‌টা শাদা, কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট, মানবের জগৎ সেই খবরটুকুমাত্র দেয় না। কোন্‌টা প্রিয়, কোন্‌টা অপ্রিয়, কোন্‌টা সুন্দর, কোন্‌টা অসুন্দর, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, মানুষের জগৎ সেই কথাটা নানা সুরে বলে।

এই যে মানুষের জগৎ, ইহা আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বহিয়া আসিতেছে। এই প্রবাহ পুরাতন এবং নিত্যনূতন। নব নব ইন্দ্রিয়—নব নব হৃদয়ের ভিতর দিয়া এই সনাতন স্রোত চিরদিনই নবীভূত হইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে পাওয়া যায় কেমন করিয়া? ইহাকে ধরিয়া রাখা যায় কি উপায়ে? এই অপরূপ মানস-জগৎকে রূপ দিয়া পুনর্ব্বার বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিলে ইহা চিরদিনই সৃষ্ট এবং চিরদিনই নষ্ট হইতে থাকে।

কিন্তু এ জিনিষ নষ্ট হইতে চায় না। হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ।

সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিষ দেখিতে হয়। ১ম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি—২য়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা?

সকল সময় এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে থাকে, সেখানেই সোনায় সোহাগা।

কবির কল্পনাসচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয়, ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে। ততই মানব-বিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে।

কিন্তু রচনাশক্তির নৈপুণ্যও সাহিত্যে মহামূল্য। কারণ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে শক্তি প্রকাশিত হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ হইলেও এই শক্তিটি একেবারে নষ্ট হয় না। ইহা ভাষার মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহাতে মানবের প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এই ক্ষমতাটি লাভের জন্য মানুষ চিরদিন ব্যাকুল। যে বৃত্তিগণের সাহায্যে মানুষের এই ক্ষমতা পরিপুষ্ট হইতে থাকে, মানুষ তাহাদিগকে যশস্বী করিয়া ঋণশোধের চেষ্টা করে।

যে মানসজগৎ হৃদয়ভাবের উপকরণে অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করিবার উপায় কি?

তাহাকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে, যাহাতে হৃদয়ের ভাব উদ্রিক্ত হয়।

হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে সাজসরঞ্জাম অনেক লাগে।

পুরুষমানুষের আপিসের কাপড় শাদাসিধা—তাহা যতই বাহুল্যবর্জ্জিত হয়, ততই কাজের উপযোগী হয়। মেয়েদের বেশভূষা, লজ্জাসরম, ভাবভঙ্গী, সমস্ত-সভ্যসমাজেই প্রচলিত।

মেয়েদের কাজ হৃদয়ের কাজ। তাহাদিগকে হৃদয় দিতে হয় ও হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয়—এই জন্য তাহাদিগকে নিতান্ত সোজাসুজি, শাদাসিধা,

ছাঁটাছোঁটা হইলে চলে না। পুরুষদের যথাযথ হওয়া আবশ্যক—কিন্তু মেয়েদের সুন্দর হওয়া চাই। পুরুষের ব্যবহার মোটের উপর সুস্পষ্ট হইলেই ভাল—কিন্তু মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ, আভাস-ইঙ্গিত থাকা চাই।

সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলঙ্কারের, রূপকের, ছন্দের, আভাসের-ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন-বিজ্ঞানের মত নিরলঙ্কার হইলে তাহার চলে না।

অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়। নারীর যেমন শ্রী এবং হ্রী, সাহিত্যের অনির্ব্বচনীয়তাটিও সেইরূপ। তাহা অনুকরণের অতীত। তাহা অলঙ্কারকে অতিক্রম করিয়া উঠে, তাহা অলঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না।

ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিষ মিশাইয়া থাকে—চিত্র এবং সঙ্গীত।

কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। "দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়" এই এক কথায় বলরামদাস কি না বলিয়াছেন? ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে? দৃষ্টি পাখীর মত উড়িয়া ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্ত্তে শান্তিলাভ করিয়াছে।

এ ছাড়া ছন্দে, শব্দে, বাক্যবিন্যাসে, সাহিত্যকে সঙ্গীতের আশ্রয় ত গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনমতে বলিবার জো নাই, এই সঙ্গীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থবিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য, এই সঙ্গীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সঙ্গীতই সঞ্চার করিয়া দেয়।

অতএব চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ।

কিন্তু কেবল মানুষের হৃদয়ই যে সাহিত্যে ধরিয়া রাখিবার জিনিষ, তাহা নহে। মানুষের চরিত্রও এমন একটি সৃষ্টি, যাহা জড়সৃষ্টির ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্তগম্য নহে। তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলে দাঁড়ায় না। তাহা মানুষের পক্ষে পরম ঔৎসুক্যজনক, কিন্তু তাহাকে পশুশালার পশুর মত বাঁধিয়া খাঁচার মধ্যে পুরিয়া ঠাহর করিয়া দেখিবার সহজ উপায় নাই।

এই ধরাবাঁধার অতীত বিচিত্র মানবচরিত্র—সাহিত্য ইহাকেও অন্তর-লোক হইতে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কারণ, মানবচরিত্র স্থির নহে, সুসঙ্গত নহে—তাহার অনেক অংশ, অনেক স্তর—তাহার সদরে-অন্দরে অবারিত গতিবিধি সহজ নয়। তা ছাড়া, তার লীলা এত সূক্ষ্ম, এত অভাবনীয়, এত আকস্মিক যে, তাহাকে পূর্ণ আকারে আমাদের হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতার কাজ। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

এইবার আমাদের সমস্ত আলোচ্য বিষয়কে এক কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র।

কিন্তু মানবচরিত্র, এটুকুও যেন বাহুল্য বলা হইল। বস্তুত বহিঃ-প্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।

ভগবানের আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে, মানবচরিত্রের মধ্যে আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিতেছে। মানুষের হৃদয়ও সাহিত্যে আপনাকে সৃজন করিবার, ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার অন্ত নাই, ইহা বিচিত্র। কবিগণ মানবহৃদয়ের এই চিরন্তন চেষ্টার উপলক্ষ্যমাত্র।

(ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত—মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দ-গীতের ঝঙ্কার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে—সেই যে মানসসঙ্গীত—ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ।) বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কি রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে—তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালমন্দ, তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে—এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায় আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

১৩১০

সাহিত্যের সামগ্রী।

একবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে। অনেকে কবিত্ব করিয়া বলেন যে, পাখী যেমন নিজের উল্লাসেই গান করে, লেখকের রচনার উচ্ছ্বাসও সেইরূপ আত্মগত—পাঠকেরা যেন তাহা আড়ি পাতিয়া শুনিয়া থাকেন।

পাখীর গানের মধ্যে পক্ষিসমাজের প্রতি যে কোনো লক্ষ্য নাই, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। না থাকে ত না-ই রহিল, তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা—কিন্তু লেখকের রচনার প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ।

তা বলিয়াই যে সেটাকে কৃত্রিম বলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। মাতার স্তন্য একমাত্র সন্তানের জন্য, তাই বলিয়াই তাহাকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বলিবার কোন বাধা দেখি না।

নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোন কোন মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই, তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মত নীরব হইয়া থাকে, তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কি আছে বা না আছে, তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কথায় বলে 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'—ভাণ্ডারে কি জমা আছে, তাহা আন্দাজে হিসাব করিয়া বাহিরের লোকের কোন সুখ নাই, তাহাদের পক্ষে মিষ্টান্নটা হাতে-হাতে পাওয়া আবশ্যক।

সাহিত্যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসও সেইরকমের একটা কথা। রচনা রচয়িতার নিজের জন্য নহে, ইহাই ধরিয়া লইতে লইবে—এবং সেইটে ধরিয়া লইয়াই বিচার করিতে হইবে।

আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়। প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিঁকিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণীদের মধ্যে সর্ব্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে।

মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেইরকমের একটা চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে এবং কালে। মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহুমনকে আয়ত্ত করা।

এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীন কাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি, কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই,

কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত তুলিতে, খোস্তায়, কলমে, কত আঁকজোক, কত প্রয়াসে—বাঁ দিক্ হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক্ হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অন্য সারে! কি? না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না, তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া, প্রবাহিত হইয়া চলিবে! আমার বাড়ীঘর, আমার আস্‌বাব্‌পত্র, আমার শরীরমন, আমার সুখদুঃখের সামগ্রী, সমস্তই যাইবে—কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের ভাবনা, মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে।

মধ্য এসিয়ায় গোবি-মরুভূমির বালুকাস্তূপের মধ্য হইতে যখন বিলুপ্ত মানব সমাজের বিস্মৃত প্রাচীনকালের জীর্ণ পুঁথি বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহার সেই অজানা ভাষার অপরিচিত অক্ষরগুলি মধ্যে কি একটি বেদনা প্রকাশ পায়! কোন্ কালের কোন্ সজীব চিত্তের চেষ্টা আজ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশলাভের জন্য আঁকুবাঁকু করিতেছে। যে লিখিয়াছিল, সে নাই, যে লোকালয়ে লেখা হইয়াছিল, তাহাও নাই—কিন্তু মানুষের মনের ভাবটুকু মানুষের সুখদুঃখের মধ্যে লালিত হইবার জন্য যুগ হইতে যুগান্তরে আসিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারিতেছে না—দুই বাহু বাড়াইয়া মুখের দিকে চাহিতেছে।

জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, পাহাড় কোনোকালে মরিবে না, সরিবে না—অনন্তকালের পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিকদের কাছে এক কথা চিরদিন ধরিয়া আবৃত্তি করিতে থাকিবে। পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয়াছিলেন।

পাহাড় কালাকালের কোন বিচার না করিয়া তাঁহার ভাষা বহন

করিয়া আসিয়াছে। কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্ম্মজাগ্রত ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন! কিন্তু পাহাড় সেদিনকার সেই কথাকয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে। কতদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে,—অশোকের সেই মহাবাণীও কত-শত-বৎসর মানবহৃদয়কে বোবার মত কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে। পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রবেগে দিগ্‌দিগন্তে প্রলয়ের কষাঘাত করিয়া গেল—কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিল না। সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্রদ্বীপের কথা অশোক কখনো কল্পনাও করেন নাই—তাঁহার শিল্পীরা পাষাণফলকে যখন তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিতেছিল, তখন যে দ্বীপের অরণ্যচারী "ড্রুয়িদ্"গণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তরস্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহুসহস্র বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ইচ্ছা এত শতাব্দী পরে একটি বিদেশীর সাহায্যে সার্থকতালাভ করিল। সে ইচ্ছা আর কিছুই নহে, তিনি যত বড় সম্রাট্ই হউন, তিনি কি চান্ কি না চান্, তাঁহার কাছে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, তাহা পথের পথিককেও জানাইতে হইবে। তাঁহার মনের ভাব এত যুগ ধরিয়া সকল মানুষের মনের আশ্রয় চাহিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রাজচক্রবর্ত্তীর সেই একাগ্র আকাঙ্ক্ষার দিকে পথের লোক কেহ বা চাহিতেছে, কেহ বা না চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে।

তাই বলিয়া অশোকের অনুশাসনগুলিকে আমি যে সাহিত্য বলিতেছি, তাহা নহে। উহাতে এইটুকু প্রমাণ হইতেছে, মানবহৃদয়ের একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষা কি? আমরা যে মূর্ত্তি গড়িতেছি, ছবি আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছি, দেশে-বিদেশে চিরকাল

ধরিয়া অবিশ্রাম এই যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।

যাহা চিরকালীন মানুষের হৃদয়ে অমর হইতে চেষ্টা করে, সাধারণত তাহা আমাদের ক্ষণকালীন প্রয়োজন ও চেষ্টা হইতে নানাপ্রকারের পার্থক্য অবলম্বন করে। আমরা সাংবৎসরিক প্রয়োজনের জন্যই ধান-যব-গম প্রভৃতি ওষধির বীজ বপন করিয়া থাকি, কিন্তু অরণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই যদি, তবে বনস্পতির বীজ সংগ্রহ করিতে হয়।

সাহিত্যে সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা। সেইজন্য দেশহিতৈষী সমালোচকেরা যতই উত্তেজনা করেন যে সারবান্ সাহিত্যের অভাব হইতেছে—কেবল নাটক-নভেল-কাব্যে দেশ ছাইয়া যাইতেছে, তবু লেখকদের হুঁস্ হয় না। কারণ সারবান্ সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি।

যাহা জ্ঞানের কথা, তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞানসম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কাল যাহা পণ্ডিতের অগম্য ছিল, আজ তাঁহা অর্ব্বাচীন বালকের কাছেও নূতন নহে। যে সত্য নূতন বেশে বিপ্লব আনয়ন করে, সেই সত্য পুরাতন বেশে বিস্ময়মাত্র উদ্রেক করে না। আজ যে সকল তত্ত্ব মূঢ়ের নিকটে পরিচিত, কোনকালে যে তাহা পণ্ডিতের নিকটেও বিস্তর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই লোকের কাছে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা, প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না। জ্ঞানের কথা একবার জানিলে আর জানিতে হয় না; আগুন গরম, সূর্য্য গোল, জল তরল, ইহা একবার জানিলেই চুকিয়া যায়—দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাহা আমাদের নূতন শিক্ষার মত জানাইতে আসে, তবে ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হয়। কিন্তু ভাবের কথা বারবার অনুভব করিয়া শ্রান্তিবোধ হয়

না। সূর্য্য যে পূর্ব্বদিকে ওঠে, এ কথা আর আমাদের মন আকর্ষণ করে না— কিন্তু সূর্য্যোদয়ের যে সৌন্দর্য্য ও আনন্দ, তাহা জীবসৃষ্টির পরহইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কাছে অম্লান আছে। এমন কি অনুভূতি যত প্রাচীন কাল হইতে যত লোকপরম্পরার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসে, ততই তাহার গভীরতা বৃদ্ধি হয়—ততই তাহা আমাদিগকে সহজে আবিষ্ট করিতে পারে।

অতএব চিরকাল যদি মানুষ আপনার কোন জিনিষ মানুষের কাছে উজ্জ্বল নবীনভাবে অমর করিয়া রাখিতে চায়, তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় করিতে হয়। এইজন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।

তাহা ছাড়া যাহা জ্ঞানের জিনিষ, তাহা এক ভাষা হইতে আর এক ভাষায় স্থানান্তর করা চলে। মূল রচনা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া অন্য রচনার মধ্যে নিবিষ্ট করিলে অনেক সময় তাহার উজ্জ্বলতাবৃদ্ধি হয়। তাহার বিষয়টি লইয়া নানা লোকে নানা ভাষায় নানা রকম করিয়া প্রচার করিতে পারে—এইরূপেই তাহার উদ্দেশ্য যথার্থভাবে সফল হইয়া থাকে।

কিন্তু ভাবের বিষয়সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাহা যে মূর্ত্তিকে আশ্রয় করে, তাহা হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। তাহার জন্য নানাপ্রকার আভাস-ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়।

এই কলাকৌশলপূর্ণ রচনা, ভাবের দেহের মত। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যকারের পরিচয়। এই দেহের প্রকৃতি ও গঠন অনুসারেই তাহার আশ্রিত ভাব মানুষের কাছে আদর পায়—ইহার শক্তি অনুসারেই তাহা হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে।

প্রাণের জিনিষ দেহের উপরে একান্ত নির্ভর করিয়া থাকে। জলের

মত তাহাকে এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে ঢালা যায় না। দেহ এবং প্রাণ পরস্পর পরস্পরকে গৌরবান্বিত করিয়া একাত্ম হইয়া বিরাজ করে।

ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের। তাহা একজন যদি বাহির না করে ত কালক্রমে আর একজন বাহির করিবে। কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। তাহা একজনের যেমন হইবে, আর একজনের তেমন হইবে না। সেইজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে—ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।

অবশ্য রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায়—কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।

দীঘি বলিতে জল এবং খনন-করা আধার দুই একসঙ্গে বোঝায়। কিন্তু কীর্ত্তি কোন্‌টা? জল মানুষের সৃষ্টি নহে—তাহা চিরন্তন। সেই জলকে বিশেষভাবে সর্ব্বসাধারণের ভোগের জন্য সুদীর্ঘকাল রক্ষা করিবার যে উপায়, তাহাই কীর্ত্তিমান্ মানুষের নিজের। ভাব সেইরূপ মনুষ্য-সাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্ত্তিতে সর্ব্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়রচনাই লেখকের কীর্ত্তি।

অতএব দেখিতেছি, ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা। অঙ্গার-জিনিষটা জলে-স্থলে-বাতাসে নানা পদার্থে সাধারণভাবে সাধারণের আছে—গাছপালা তাহাকে নিগূঢ় শক্তি-বলে বিশেষ আকারে প্রথমত নিজের করিয়া লয়, এবং সেই উপায়েই তাহা সুদীর্ঘকাল বিশেষভাবে সর্ব্বসাধারণের ভোগের দ্রব্য হইয়া উঠে। শুধু যে তাহা আহার এবং উত্তাপের কাজে লাগে, তাহা নহে—তাহা হইতে সৌন্দর্য্য, ছায়া, স্বাস্থ্য বিকীর্ণ হইতে থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে, সাধারণের জিনিষকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

তা যদি হয়, তবে জ্ঞানের জিনিষ সাহিত্য হইতে আপনি বাদ পড়িয়া যায়। কারণ, ইংরাজিতে যাহাকে ট্রুথ্ বলে এবং বাংলাতে যাহাকে আমরা সত্য নাম দিয়াছি অর্থাৎ যাহা আমাদের বুদ্ধির অধিগম্য বিষয়—তাহাকে ব্যক্তিবিশেষের নিজত্ববর্জ্জিত করিয়া তোলাই একান্ত দরকার। সত্য সর্ব্বাংশেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ, শুভ্র-নিরঞ্জন। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আমার কাছে একরূপ, অন্যের কাছে অন্যরূপ নহে। তাহার উপরে বিচিত্র হৃদয়ের নূতন নূতন রঙের ছায়া পড়িবার জো নাই।

যে সকল জিনিষ অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর, রং, ইঙ্গিত প্রার্থনা করে—যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে প্রকারে, ভাবে-ভাষায়, সুরে-ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে—তাহা মানুষের একান্ত আপনার—তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি। সুতরাং তাহা একবার প্রকাশিত হইয়া উঠিলে তাহার রূপান্তর, অবস্থান্তর করা চলে না—তাহার প্রত্যেক অংশের উপরে তাহার সমগ্রতা একান্তভাবে নির্ভর করে। যেখানে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায়, সেখানে সাহিত্য-অংশে তাহা হেয়।

১৩১০

সাহিত্যের বিচারক।

ঘরে বসিয়া আনন্দে যখন হাসি এবং দুঃখে যখন কাঁদি, তখন এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, আরো একটু বেশি করিয়া হাসা দরকার বা কান্নাটা ওজনে কিছু কম পড়িয়াছে। কিন্তু পরের কাছে যখন আনন্দ বা দুঃখ দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখন মনের ভাবটা

সত্য হইলেও বাহিরের প্রকাশটা সম্পূর্ণ তাহার অনুযায়ী না হইতে পারে।

এমন কি, মা-ও যখন সশব্দ বিলাপে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা দূর করিয়া দেয়, তখন সে যে শুদ্ধমাত্র পুত্রশোক প্রকাশ করে তাহা নয়, পুত্রশোকের গৌরব প্রকাশ করিতেও চায়। নিজের কাছে দুঃখ-সুখ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না—পরের কাছে তাহা প্রমাণ করিতে হয়। সুতরাং শোকপ্রকাশের জন্য যেটুকু কান্না স্বাভাবিক, শোক প্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।

ইহাকে কৃত্রিমতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে অন্যায় হইবে। শোকপ্রমাণ শোকপ্রকাশের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ। আমার ছেলের মূল্য যে কেবল আমারই কাছে বেশি, তাহার বিচ্ছেদ যে কতখানি মর্ম্মান্তিক ব্যাপার তাহা পৃথিবীর আর কেহই যে বুঝিবে না, তাহার অভাবসত্ত্বেও পৃথিবীর আর সকলেই যে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে আহারনিদ্রা ও আপিস-যাতায়াতে প্রবৃত্ত থাকিবে, শোকাতুর মাতাকে তাহার পুত্রের প্রতি জগতের এই অবজ্ঞা আঘাত করিতে থাকে। তখন সে নিজের শোকের প্রবলতার দ্বারা এই ক্ষতির প্রাচুর্য্যকে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করিয়া তাহার পুত্রকে যেন গৌরবান্বিত করিতে চায়।

যে অংশে শোক নিজের, সে অংশে তাহার একটি স্বাভাবিক সংযম থাকে, যে অংশে তাহা পরের কাছে ঘোষণা, তাহা অনেক সময়েই সঙ্গতির সীমা লঙ্ঘন করে। পরের অসাড়চিত্তকে নিজের শোকের দ্বারা বিচলিত করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছায় তাহার চেষ্টা অস্বাভাবিক উদ্যম অবলম্বন করে।

কেবল শোক নহে, আমাদের অধিকাংশ হৃদয়ভাবেরই এই দুইটা দিক্‌ই আছে, একটা নিজের জন্য, একটা পরের জন্য। আমার হৃদয়-ভাবকে সাধারণের হৃদয়ভাব করিতে পারিলে তাহার একটা সান্ত্বনা,

একটা গৌরব আছে। আমি যাহাতে বিচলিত, তুমি তাহাতে উদাসীন, ইহা আমাদের কাছে ভাল লাগে না।

কারণ, নানা লোকের কাছে প্রমাণিত না হইলে সত্যতার প্রতিষ্ঠা হয় না। আমিই যদি আকাশকে হলদে দেখি, আর দশজনে না দেখে, তবে তাহাতে আমার ব্যাধিই সপ্রমাণ হয়! সেটা আমারই দুর্ব্বলতা।

আমার হৃদয়বেদনায় পৃথিবীর যত বেশি লোক সমবেদনা অনুভব করিবে, ততই তাহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যাহা একান্তভাবে অনুভব করিতেছি, তাহা যে আমার দুর্ব্বলতা, আমার ব্যাধি, আমার পাগ্‌লামি নহে, তাহা যে সত্য, তাহা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে প্রমাণিত করিয়া আমি বিশেষভাবে সান্ত্বনা ও সুখ পাই।

যাহা নীল, তাহা দশজনের কাছে নীল বলিয়া প্রচার করা কঠিন নহে, কিন্তু যাহা আমার কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, তাহা দশজনের কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া প্রতীত করা দুরূহ। সে অবস্থায় নিজের ভাবকে কেবলমাত্র প্রকাশ করিয়াই খালাস পাওয়া যায় না; নিজেব ভাবকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে পরের কাছেও তাহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে।

সুতরাং এইখানেই বাড়াবাড়ি হইবার সম্ভাবনা। দূর হইতে যে জিনিষটা দেখাইতে হয়, তাহা কতকটা বড় করিয়াই দেখান আবশ্যক। সেটুকু বড়, সত্যের অনুরোধেই কবিতে হয়। নহিলে জিনিষটা যে পবিমাণে ছোট দেখায়, সেই পরিমাণেই মিথ্যা দেখায়। বড় করিয়াই তাহাকে সত্য কবিতে হয়।

আমার সুখদুঃখ আমাব কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড় করিয়াই বলিতে হয়।

সত্যরক্ষাপূর্ব্বক এই বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের

যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক তেম্নি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।

কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি, তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।

প্রাকৃতসত্যে এবং সাহিত্যসত্যে এইখানেই তফাৎ আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে, প্রাকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না। তাই বলিয়া সাহিত্যে মার কান্না মিথ্যা নহে। প্রথমত প্রাকৃত রোদন এমন প্রত্যক্ষ যে, তাহার বেদনা আকারে-ইঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে, চারিদিকের দৃশ্যে এবং শোকঘটনার নিশ্চয় প্রমাণে আমাদের প্রতীতি ও সমবেদনা উদ্রেক করিয়া দিতে বিলম্ব করে না। দ্বিতীয়ত প্রাকৃত মা আপনার শোক সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারে না, সে ক্ষমতা তাহার নাই, সে অবস্থাও তাহার নয়।

এই জন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এস্থলে একটি অপবর্টির আরশি হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না।

এই প্রত্যক্ষতার অভাববশত সাহিত্যে ছন্দোবন্ধ-ভাবাভঙ্গীর নানা-প্রকার কল-বল আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।

এখানে "অধিকতর সত্য" এই কথাটা ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। মানুষের ভাবসম্বন্ধে প্রাকৃত সত্য জড়িত-মিশ্রিত, ভগ্নখণ্ড, ক্ষণস্থায়ী। সংসারের ঢেউ ক্রমাগতই ওঠাপড়া করিতেছে—

দেখিতে দেখিতে একটার ঘাড়ে আর একটা আসিয়া পড়িতেছে—তাহার মধ্যে প্রধান-অপ্রধানের বিচার নাই—তুচ্ছ ও অসামান্য গায়ে-গায়ে ঠেলাঠেলি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির এই বিরাট রঙ্গশালায় যখন মানুষের ভাবাভিনয় আমরা দেখি, তখন আমরা স্বভাবতই অনেক বাদসাদ দিয়া বাছিয়া লইয়া আন্দাজের দ্বারা অনেকটা ভর্ত্তি করিয়া, কল্পনার দ্বারা অনেকটা গড়িয়া তুলিয়া থাকি। আমাদের একজন পরমাত্মীয়ও তাহার সমস্তটা লইয়া আমাদের কাছে পরিচিত নহেন। আমাদের স্মৃতি নিপুণ সাহিত্যরচয়িতার মত তাঁহার অধিকাংশই বাদ দিয়া ফেলে। তাঁহার ছোটবড় সমস্ত অংশই যদি ঠিক সমান অপক্ষপাতের সহিত আমাদের স্মৃতি অধিকার করিয়া থাকে, তবে এই স্তূপের মধ্যে আসল চেহারাটি মারা পড়ে ও সবটা রক্ষা করিতে গেলে আমাদের পরমাত্মীয়কে আমরা যথার্থভাবে দেখিতে পাই না। পরিচয়ের অর্থই এই যে, যাহা বর্জ্জন করিবার তাহা বর্জ্জন করিয়া, যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করা।

একটু বাড়াইতেও হয়। আমাদের পরমাত্মীয়কেও আমরা মোটের উপরে অল্পই দেখিয়া থাকি। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ আমাদের অগোচর। আমরা তাঁহার ছায়া নহি, আমরা তাঁহার অন্তর্যামীও নই। তাঁহার অনেকখানিই যে আমরা দেখিতে পাই না, সেই শূন্যতার উপরে আমাদের কল্পনা কাজ করে। ফাঁকগুলি পূরাইয়া লইয়া আমরা মনের মধ্যে একটা পূর্ণ ছবি আঁকিয়া তুলি। যে লোকের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা খেলে না, যাহার ফাঁক আমাদের কাছে ফাঁক থাকিয়া যায়, যাহার প্রত্যক্ষগোচর অংশই আমাদের কাছে বর্ত্তমান, অপ্রত্যক্ষ অংশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট অগোচর, তাহাকে আমরা জানি না, অল্পই জানি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এইরূপ আমাদের কাছে ছায়া, আমাদের কাছে অসত্যপ্রায়। তাহাদের অনেককেই আমরা উকিল বলিয়া জানি, ডাক্তার বলিয়া জানি, দোকানদার বলিয়া জানি—মানুষ বলিয়া জানি না। অর্থাৎ

আমাদের সঙ্গে যে বহির্বিষয়ে তাহাদের সংস্রব, সেইটেকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া জানি—তাহাদের মধ্যে তদপেক্ষা বড় যাহা আছে, তাহা আমাদের কাছে কোন আমল পায় না।

সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানায়—অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটকে ছোট করিয়া বড়কে বড় করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আল্‌গাকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়! প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্য্যের মধ্যে মন যাহা করিতে চায়, সাহিত্য তাহাই করিতে থাকে। মন প্রকৃতির আরশি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিষকে মানসিক করিয়া লয়—সাহিত্য সেই মানসিক জিনিষকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।

দুয়ের কার্য্যপ্রণালী প্রায় একই রকম। কেবল দুয়ের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ কারণে তফাৎ ঘটিয়াছে। মন যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা নিজের আবশ্যকের জন্য—সাহিত্য যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা সকলের আনন্দের জন্য। নিজের জন্য একটা মোটামুটি নোট্ করিয়া রাখিলেও চলে—সকলের জন্য আগাগোড়া সুসম্বদ্ধ করিয়া তুলিতে হয়। এবং তাহাকে এমন জায়গায় এমন আলোকে এমন করিয়া ধরিতে হয়, যাহাতে সম্পূর্ণভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। মন সাধারণত প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে—সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সঞ্চয় করে। মনের জিনিষকে বাহিরে ফলাইয়া তুলিতে গেলে বিশেষভাবে সৃজনশক্তির আবশ্যক হয়। এইরূপে প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে, তাহা অনুকরণ হইতে বহুদূরবর্ত্তী।

প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনাকে, আমাদের সুখদুঃখকে, শুদ্ধ বর্ত্তমান কাল নহে, চিরন্তন কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। সুতরাং সেই সুবিশাল প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রের সহিত তাহার পরিমাণসামঞ্জস্য করিতে হয়! ক্ষণকালের মধ্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে

যখন চিরকালের জন্য গড়িয়া তোলা যায়, তখন ক্ষণকালের মাপকাঠি লইয়া কাজ চলে না। এই কারণে প্রচলিত কালের সহিত, সঙ্কীর্ণ সংসারের সহিত, উচ্চসাহিত্যের পরিমাণের প্রভেদ থাকিয়া যায়।

অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষার, নিজের জিনিষকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত সাহিত্যকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই প্রতিভাকে বিশ্বমানবমন নাম দিলে ক্ষতি নাই। জগৎ হইতে মন আপনার জিনিষ সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানবমন পুনশ্চ নিজের জিনিষ নির্ব্বাচন করিয়া নিজের জন্য গড়িয়া লইতেছে।

বুঝিতেছি কথাটা বেশ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে। আর একটু পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। কৃতকার্য্য হইব কি না, জানি না।

আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। একটা অংশ আমার নিজত্ব, আর একটা অংশ আমার মানবত্ব। আমার ঘরটা যদি সচেতন হইত, তবে সে নিজের ভিতরকার খণ্ডাকাশ ও তাহারই সহিত পরিব্যাপ্ত মহাকাশ, এই দুটাকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিত। আমাদের ভিতরকার নিজত্ব ও মানবত্ব সেইপ্রকার। যদি দুয়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য দেয়াল তোলা থাকে, তবে আত্মা অন্ধকূপের মধ্যে বাস করে।

প্রকৃত সাহিত্যকারের অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজত্ব ও মানবত্বের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে, তবে তাহা কল্পনার কাচের সাশির স্বচ্ছ ব্যবধান। তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনা-পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না। এমন কি, এই কাচ দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের কাচের কাজ করিয়া থাকে—ইহা অদৃশ্যকে দৃশ্য, দূরকে নিকট করে।

সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্ত্তা। লেখকের নিজত্বকে সে আপনার করিয়া লয়, ক্ষণিককে সে অমর করিয়া তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে।

জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে—এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনোরাজ্যের কথা আসিয়া পড়িলে সত্যতা বিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কালোকে কালো প্রমাণ করা সহজ, কারণ অধিকাংশের কাছেই তাহা নিশ্চয় কালো—কিন্তু ভালোকে ভালো প্রমাণ করা তেমন সহজ নহে, কারণ এখানে অধিকাংশের একমত সাক্ষ্য সংগ্রহ করা কঠিন।

এখানে অনেকগুলি মুস্কিলের কথা আসিয়া পড়ে। অধিকাংশের কাছেই যাহা ভাল, তাহাই কি সত্য ভাল, না, বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে যাহা ভাল, তাহাই সত্য ভাল?

যদি বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে প্রাকৃতবস্তুসম্বন্ধে এ কথা নিশ্চয় বলিতে হয় যে,অধিকাংশের কাছে যাহা কালো, তাহাই সত্য কালো। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, এ সম্বন্ধে মতভেদের সম্ভাবনা এত অল্প যে, অধিক সাক্ষ্য সংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু ভালো যে ভালোই এবং কত ভালো, তাহা লইয়া মতের এত অনৈক্য ঘটিয়া থাকে যে, সে সম্বন্ধে কিরূপ সাক্ষ্য লওয়া উচিত, তাহা স্থির করা কঠিন হয়।

বিশেষ কঠিন এই জন্য, সাহিত্যকারদের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্ত্তমান কালের জন্য নহে। চিরকালের মনুষ্যসমাজই তাঁহাদের লক্ষ্য। যাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের জন্য লিখিত, তাহার অধিকাংশ সাক্ষী ও বিচারক বর্ত্তমান কাল হইতে কেমন করিয়া মিলিবে?

ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহা তৎসাময়িক ও তৎস্থানিক, তাহাই

অধিকাংশ লোকের কাছে সর্ব্বপ্রধান আসন অধিকার করে। কোন একটি বিশেষ সময়ের সাক্ষীসংখ্যা গণনা করিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে অবিচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এইজন্য বর্ত্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্যনিবেশ করিতে হয়।

কালে কালে মানুষের বিচিত্র শিক্ষা, ভাব ও অবস্থার পরিবর্ত্তনসত্ত্বেও যে সকল রচনা আপন মহিমা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহাদেরই অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গেছে। মন আমাদের সহজগোচর নয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে অবিশ্রাম গতির মধ্যে তাহার নিত্যানিত্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। এইজন্য সুবিপুল কালের পরিদর্শনশালার মধ্যেই মানুষের মানসিক বস্তুর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়—ইহা ছাড়া নিশ্চয় অবধারণের চূড়ান্ত উপায় নাই।

কিন্তু কাজ চলিবার মত উপায় না থাকিলে সাহিত্যে অরাজকতা উপস্থিত হইত। হাইকোর্টের আপিল-আদালতে যে জজ-আদালতের সমস্ত বিচারই পর্য্যন্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। সাহিত্যেও সেইরূপ জজ-আদালতের কাজ বন্ধ থাকিতে পারে না। আপিলের শেষমীমাংসা অতি-দীর্ঘকালসাপেক্ষ ততক্ষণ মোটামুটি বিচার একরকম পাওয়া যায় এবং অবিচার পাইলেও উপায় নাই।

যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক এক জনের প্রতিভা সর্ব্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে,—সর্ব্বকালের আসন অধিকার করে, তেম্নি বিচারের প্রতিভাও আছে। একএকজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সঙ্কীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্ত্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত

পাইয়া লইয়াছেন—স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্ব্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আবার ব্যবসাদার বিচারকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বতপ্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জ্জনগর্জ্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে—অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়িজুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে। কিন্তু বীণাপাণীর অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরলবেশে দীনের মত মার কাছে যায় এবং তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করেন। তাহারা কখন-কখন তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছু-কিছু ধূলিক্ষেপও করে—তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন। এই সমস্ত ধূলা-মাটি-সত্ত্বেও দেবী যাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লন—দেউড়ির দরোয়ানগুলা তাহাদিগকে চিনিবে কোন্ লক্ষণ দেখিয়া? তাহারা পোষাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই। সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপরে আছে, তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান—তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্য্যাদা বোঝেন।

সৌন্দর্য্যবোধ।

প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়া নিয়মে-সংযমে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতবর্ষের এই প্রাচীন উপদেশের কথা তুলিতে গেলে অনেকের মনে এই তর্ক উঠিবে, “এ যে বড় কঠোর সাধনা। ইহার দ্বারা না হয় খুব একটা শক্ত মানুষ তৈরি করিয়া তুলিলে, না হয় বাসনার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া মস্ত একজন সাধুপুরুষ হইয়া উঠিলে, কিন্তু এ সাধনায়

রসের স্থান কোথায়? কোথায় গেল সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত? মানুষকে যদি পূরা করিয়া তুলিতে হয়, তবে সৌন্দর্য্যচর্চ্চাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।"

এ ত ঠিক কথা। সৌন্দর্য্য ত চাই। আত্মহত্যা ত সাধনার বিষয় হইতে পাবে না, আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য। বস্তুত শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্য্যপালন শুষ্কতার সাধনা নয়। ক্ষেত্রকে মরুভূমি করিয়া তুলিবার জন্য চাষা খাটিয়া মরে না। চাষা যখন লাঙল দিয়া মাটি বিদীর্ণ করে, মই দিয়া ঢেলা দলিয়া গুঁড়া করিতে থাকে, নিড়ানী দিয়া সমস্ত ঘাস ও গুল্ম উপ্‌ড়াইয়া ক্ষেত্রটাকে একেবারে শূন্য করিয়া ফেলে, তখন আনাড়ি লোকের মনে হইতে পারে, জমিটার উপর উৎপীড়ন চলিতেছে। কিন্তু এম্‌নি করিয়াই ফল ফলাইতে হয়। তেম্‌নি যথার্থভাবে রসগ্রহণের অধিকারী হইতে গেলে গোড়ায় কঠিন চাষেরই দরকাব। রসের পথেই পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ আছে। সে পথে সমস্ত বিপদ্ এড়াইয়া পূর্ণতালাভ করিতে যে চায়, নিয়মসংযম তাহারই বেশি আবশ্যক। রসের জন্যই এই নীবসতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, উপলক্ষ্যের দ্বাবা লক্ষ্য প্রায়ই চাপা পড়ে; সে গান শিখিতে চায়, ওস্তাদী শিখিয়া বসে; ধনী হইতে চায়, টাকা জমাইয়া কৃপাপাত্র হইয়া ওঠে; দেশের হিত চায়, কমিটিতে রেজোল্যুশন্ পাস্ করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

তেম্‌নি নিয়মসংযমটাই চরম লক্ষ্যের সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে, এ আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। নিয়মটাকেই যাহারা লাভ, যাহারা পুণ্য মনে করে, তাহারা নিয়মের লোভে একেবারে লুব্ধ হইয়া উঠে। নিয়মলোলুপতা ষড়্‌রিপুর জায়গায় সপ্তম রিপু হইয়া দেখা দেয়।

এটা মানুষের জড়ত্বের একটা লক্ষণ। সঞ্চয় করিতে সুরু করিলে

মানুষ আর থামিতে চায় না। বিলাতের কথা শুনিতে পাই, সেখানে কত লোক পাগলের মত কেবল দেশবিদেশের ছাপমারা ডাকের টিকিট সংগ্রহ করিতেছে, সেজন্য সন্ধানের এবং খরচের অন্ত নাই। এইরূপ সংগ্রহবায়ুদ্বারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া কেহ বা চিনের বাসন, কেহ বা পুরাতন জুতা সংগ্রহ করিয়া মরিতেছে। উত্তরমেরুর ঠিক কেন্দ্রস্থানটিতে গিয়া কোনোমতে একটা ধ্বজা পুঁতিয়া আসিতে হইবে, সেও এম্নি একটা ব্যাপার। সেখানে বরফের ক্ষেত্রছাড়া আর কিছু নাই কিন্তু মন নিবৃত্ত হইতেছে না—কে সেই মেরুমরুর কেন্দ্রবিন্দুটির কত মাইল কাছে যাইতেছে, তাহারই অঙ্কপাতের নেশা পাইয়া বসিয়াছে। পাহাড়ে যে যত ফুট উচ্চে উঠিয়াছে, সে ততটাকেই একটা লাভ বলিয়া গণ্য করিতেছে; এই শূন্য লাভের জন্য নিজে মরিতেছে এবং কত অনিচ্ছুক মজুরদিগকে জোর করিয়া মারিতেছে, তবু থামিতে চাহিতেছে না।

অপব্যয় এবং ক্লেশ যতই বেশি, প্রয়োজনহীন সঞ্চয় ও পরিণামহীন জয়লাভের গৌরবও তত বেশি বলিয়া বোধ হয়। নিয়ম সাধনার লোভও ক্লেশের পরিমাণ খতাইয়া আনন্দভোগ করে। কঠিন শয্যায় শুইয়া যদি সুরু করা যায়, তবে মাটিতে বিছানা পাতিয়া, পরে একখানিমাত্র কম্বল বিছাইয়া, পরে কম্বল ছাড়িয়া শুধু মাটিতে শুইবার লোভ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে থাকে। কৃচ্ছ্রসাধনটাকেই লাভ মনে করিয়া শেষকালে আত্মঘাতে আসিয়া দাঁড়ি টানিতে হয়। ইহা আর-কিছু নয়, নিবৃত্তিকেই একটা প্রচণ্ড প্রবৃত্তি করিয়া তোলা, গলার ফাঁস ছিঁড়িবার চেষ্টাতেই গলায় ফাঁস আঁটিয়া মরা।

অতএব কেবলমাত্র নিয়মপালন করাটাকেই যদি লোভের জিনিষ করিয়া তোলা যায়, তবে কঠোরতার চাপ কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়া স্বভাব হইতে সৌন্দর্য্যবোধকে একেবারে পিষিয়া বাহির করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ণতালাভের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া সংযমচর্চ্চাকেও

যদি ঠিকমত সংযত করিয়া রাখিতে পারি, তবে মনুষ্যত্বের কোনো উপাদানই আঘাত পায় না, বরঞ্চ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।)

(কথাটা এই যে, ভিতমাত্রই শক্ত হইয়া থাকে, না হইলে তাহা আশ্রয় দিতে পারে না।) যাহা-কিছু ধারণ করিয়া থাকে, যাহা আকৃতিদান করে, তাহা কঠিন। মানুষের শরীর যতই নরম হোক্ না কেন, যদি শক্ত হাড়ের উপরে তাহার পত্তন না হইত, তবে সে একটা পিণ্ড হইয়া থাকিত, তাহার চেহারা খুলিতই না। তেম্‌নি জ্ঞানের ভিত্তিটাও শক্ত, আনন্দের ভিত্তিটাও শক্ত। জ্ঞানের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত, তবে ত সে কেবল খাপছাড়া স্বপ্ন হইত, আর আনন্দের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত, তবে তাহা নিতান্তই পাগ্‌লামি মাত্‌লামি হইয়া উঠিত।

এই যে শক্ত ভিত্তি, ইহাই সংযম। ইহার মধ্যে বিচার আছে, বল আছে, ত্যাগ আছে, ইহার মধ্যে নির্ম্মম দৃঢ়তা আছে। ইহা দেবতার মত এক হাতে বর দেয়, আর এক হাতে সংহার করে। এই সংযম গড়িবার বেলাও যেমন দৃঢ়, ভাঙিবার বেলাও তেম্‌নি কঠিন। (সৌন্দর্য্যকে পূরামাত্রায় ভোগ করিতে গেলে এই সংযমের প্রয়োজন; নতুবা প্রবৃত্তি অসংযত থাকিলে শিশু ভাতের থালা লইয়া যেমন অন্নব্যঞ্জন কেবল গায়ে মাখিয়া মাটিতে ছড়াইয়া বিপরীত কাণ্ড করিয়া তোলে, অথচ অল্পই তাহার পেটে যায়—ভোগের সামগ্রী লইয়া আমাদের সেই দশা হয়; আমরা কেবল তাহা গায়েই মাখি, লাভ করিতে পারি না।)

সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম্ম নহে। সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না। একটুতেই আগুন হাতের বাহির হইয়া যায় বলিয়াই ঘর আলো করিতে আগুণের উপরে দখল রাখা চাই। প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। প্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পূরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই, তবে যে-সৌন্দর্য্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন, তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া

তবে সে ছাড়ে, ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ধূলায় লুটাইয়া দেয়।

এ কথা সত্য, সংসারে আমাদের ক্ষুধিত প্রবৃত্তি যেখানে পাত পাড়িয়া বসে, তাহার কাছাকাছি প্রায়ই একটা সৌন্দর্য্যের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। ফল যে কেবল আমাদের পেট ভরায়, তাহা নহে, তাহা স্বাদে, গন্ধে, দৃশ্যে সুন্দর। কিছুমাত্র সুন্দর যদি না-ও হইত তবু আমরা তাহাকে পেটের দায়েই খাইতাম। আমাদের এত বড় একটা গরজ থাকা সত্ত্বেও কেবল পেট ভরাইবার দিক্ হইতে নয়, সৌন্দর্য্যভোগের দিক্ হইতেও সে আমাদিগকে আনন্দ দিতেছে। এটা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাভ।

জগতে সৌন্দর্য্য বলিয়া এই যে আমাদের একটা উপরি পাওনা, ইহা আমাদের মনকে কোন্‌দিকে চালাইতেছে? ক্ষুধাতৃপ্তির ঝোঁকটাই যাহাতে একেশ্বর হইয়া না ওঠে, যাহাতে আমাদের মন হইতে তাহার ফাঁস একটু আল্‌গা হয়, সৌন্দর্য্যের সেই চেষ্টা দেখিতে পাই। চণ্ডী ক্ষুধা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিতেছে, তোমাকে খাইতেই হইবে, ইহার উপরে আর কোনো কথা নাই। অমনি সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী হাসিমুখে সুধাবর্ষণ করিয়া অত্যুগ্র প্রয়োজনের চোখরাঙানিকে আড়াল করিয়া দিতেছেন, পেটের জ্বালাকে নীচের তলায় রাখিয়া উপরের মহালে আনন্দভোজের মনোহর আয়োজন করিতেছেন। অনিবার্য্য প্রয়োজনের মধ্যে মানুষের একটা অবমাননা আছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য নাকি প্রয়োজনের বাড়া, এইজন্য সে আমাদের অপমান দূর করিয়া দেয়। সৌন্দর্য্য আমাদের ক্ষুধাতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বদা একটা উচ্চতর সুর লাগাইতেছে বলিয়াই, যাহারা একদিন অসংযত বর্ব্বর ছিল, তাহারা আজ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে,—যে কেবল ইন্দ্রিয়েরই দোহাই মানিত, সে আজ প্রেমের বশ মানিয়াছে। আজ ক্ষুধা লাগিলেও আমরা পশুর মত রাক্ষসের মত যেমন তেমন করিয়া

খাইতে বসিতে পারি না—শোভনতাটুকু রক্ষা না করিলে আমাদের খাইবার প্রবৃত্তিই চলিয়া যায়। অতএব এখন আমাদের খাইবার প্রবৃত্তিই একমাত্র নহে, শোভনতা তাহাকে নরম করিয়া আনিয়াছে। আমরা ছেলেকে লজ্জা দিয়া বলি, ছিছি অমন লোভীর মত খাইতে আছে! সেরূপ খাওয়া দেখিতে কুশ্রী। সৌন্দর্য্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে। জগতের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব, আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের মুক্তি।

তবেই দেখা যাইতেছে, পরিণামে সৌন্দর্য্য মানুষকে সংযমের দিকেই টানিতেছে। মানুষকে সে এমন একটি অমৃত দিতেছে, যাহা পান করিয়া মানুষ ক্ষুধার রূঢ়তাকে দিনে দিনে জয় করিতেছে। অসংযমকে অমঙ্গল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে যাহার মনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সে তাহাকে অসুন্দর বলিয়া ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতে চাহিতেছে।

সৌন্দর্য্য যেমন আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, সংযমও তেম্‌নি আমাদের সৌন্দর্য্য-ভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে। স্তব্ধভাবে নিবিষ্ট হইতে না জানিলে আমরা সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থান হইতে রস উদ্ধার করিতে পারি না। এক-পরায়ণা সতী স্ত্রীই ত প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে, স্বৈরিণী ত পারে না। সতীত্ব সেই চাঞ্চল্যবিহীন সংযম, যাহার দ্বারা গভীরভাবে প্রেমের নিগূঢ়রস লাভ করা সম্ভব হয়। আমাদের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার মধ্যেও যদি সেই সতীত্বের সংযম না থাকে, তবে কি হয়? সে কেবলই সৌন্দর্য্যের বাহিরে বাহিরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; মত্ততাকেই আনন্দ বলিয়া ভুল করে; যাহাকে পাইলে সে একেবারে সব ছাড়িয়া স্থির হইয়া বসিতে পারিত, তাহাকে পায় না। যথার্থ সৌন্দর্য্য সমাহিত

সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে। যে লোক পেটুক, সে ভোজনের রসজ্ঞ হইতে পারে না।

পৌষ্যরাজা ঋষিকুমার উতঙ্ককে কহিলেন, যাও অন্তঃপুরে যাও, সেখানে মহিষীকে দেখিতে পাইবে। উতঙ্ক অন্তঃপুরে গেলেন, কিন্তু মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না! অশুচি হইয়া কেহ সতীকে দেখিতে পাইত না—উতঙ্ক তখন অশুচি ছিলেন।

বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যের, সমস্ত মহিমার অন্তঃপুরে যে সতীলক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, তিনিও আমাদের সম্মুখেই আছেন, কিন্তু শুচি না হইলে দেখিতে পাইব না। যখন বিলাসে হাবুডুবু খাই, ভোগের নেশায় মাতিয়া বেড়াই, তখন বিশ্বজগতের আলোকবসনা সতীলক্ষ্মী আমাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্ধান করেন।

এ কথা ধর্ম্মনীতিপ্রচারের দিক্ হইতে বলিতেছি না; আনন্দের দিক্ হইতে—যাহাকে ইংরেজীতে আর্ট বলে—তাহারই তরফ হইতে বলিতেছি। আমাদের শাস্ত্রেও বলে, কেবল ধর্ম্মের জন্যে নয়,সুখের জন্যও সংযত হইবে। সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। অর্থাৎ ইচ্ছার যদি চরিতার্থতা চাও, তবে ইচ্ছাকে শাসনে রাখ—যদি সৌন্দর্য্যভোগ করিতে চাও, তবে ভোগলালসাকে দমন করিয়া শুচি হইয়া শান্ত হও। প্রবৃত্তিকে যদি দমন করিতে না জানি, তবে প্রবৃত্তিরই চরিতার্থতাকে আমরা সৌন্দর্য্যবোধের চরিতার্থতা বলিয়া ভুল করি—যাহা চিত্তের জিনিষ, তাহাকে দুই হাতে করিয়া দলিয়া মনে করি, যেন তাহাকে পাইলাম। *এইজন্যই বলিয়াছি, সৌন্দর্য্যবোধ ঠিকমত* উদ্বোধনের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের সাধনই আবশ্যক।

যাঁহাদের চোকে ধূলা দেওয়া শক্ত, তাঁহারা হঠাৎ সন্দিগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিবেন, এ যে একেবারে কবিত্ব আসিয়া পড়িল। তাঁহারা বলিবেন, সংসারে ত আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে-সকল কলাকুশল গুণীরা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই সংযমের দৃষ্টান্ত রাখিয়া

যান নাই। তাঁহাদের জীবনচরিতটা পাঠ্য নহে। অতএব কবিত্ব রাখিয়া এই বাস্তব সত্যটার আলোচনা করা দরকার।

আমার বক্তব্য এই যে, বাস্তবকে আমরা এত বেশি বিশ্বাস করি কেন? কারণ, সে প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু অনেকস্থলেই মানুষের সম্বন্ধে আমরা যাহাকে বাস্তব বলি, তাহার বেশির ভাগই আমাদের অপ্রত্যক্ষ। একটুখানি দেখিতে পাই বলিয়া মনে করি সবটাই যেন দেখিতে পাইলাম, এইজন্য মানুষঘটিত বাস্তববৃত্তান্ত লইয়া একজন যাহাকে শাদা বলে, আর একজন তাহাকে মেটে বলিলেও বাঁচিতাম, তাহাকে একেবারে কালো বলিয়া বসে। নেপোলিয়ন্‌কে কেহ বলে দেবতা, কেহ বলে দানব। আকবরকে কেহ বলে উদার প্রজাহিতৈষী, কেহ বলে তাঁহার হিন্দুপ্রজার পক্ষে তিনিই যত নষ্টের গোড়া। কেহ বলেন বর্ণভেদেই আমাদের হিন্দুসমাজ রক্ষা করিয়াছে, কেহ বলে বর্ণভেদের প্রথাই আমাদিগকে একেবারে মাটি করিয়া দিল। অথচ উভয় পক্ষেই বাস্তব-সত্যের দোহাই দেয়।

বস্তুত মানুষঘটিত ব্যাপারে একই জায়গায় আমরা অনেক উল্টাকাণ্ড দেখিতে পাই। মানুষের দেখা-অংশের মধ্যে যে সকল বৈপরীত্য প্রকাশ পায়, মানুষের না-দেখা অংশের মধ্যেই নিশ্চয় তাহার একটা নিগূঢ় সমন্বয় আছে;—অতএব আসল সত্যটা যে প্রত্যক্ষের উপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহা নহে, অপ্রত্যক্ষের মধ্যেই ডুবিয়া আছে—এইজন্যই তাহাকে লইয়া এত তর্ক, এত দলাদলি এবং এইজন্যই একই ইতিহাসকে দুই বিরুদ্ধপক্ষে ওকালতনামা দিয়া থাকে।

জগতের কলানিপুণ গুণীদের সম্বন্ধেও যেখানে আমরা উল্টাকাণ্ড দেখিতে পাই, সেখানেও বাস্তবসত্যের বড়াই করিয়া হঠাৎ কিছু বিরুদ্ধ কথা বলিয়া বসা যায় না। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দুর্ব্বলতা হইতে, চঞ্চলতা হইতে, অসংযম হইতে ঘটিতেছে, এটা যে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা।

বাস্তবসত্য সাক্ষ্য দিলেও আমরা বলিব, নিশ্চয় সকল সাক্ষীকে হাজির পাওয়া যায় নাই, আসল সাক্ষীটি পালাইয়া বসিয়া আছে। যদি দেখি কোনো ডাকাতের দল খুবই উন্নতি করিতেছে, তবে সেই বাস্তবসত্যের সহায়ে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, দস্যুবৃত্তিই উন্নতির উপায়। তখন এই কথা বিনা প্রমাণেই বলা যাইতে পারে যে, দস্যুদের আপাতত যেটুকু উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহার মূল কারণ নিজেদের মধ্যে ঐক্য, অর্থাৎ দলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ধর্ম্মরক্ষা; আবার এই উন্নতি যখন নষ্ট হইবে, তখন এই ঐক্যকেই নষ্ট হইবার কারণ বলিয়া বসিব না, তখন বলিব অন্যের প্রতি অধর্ম্মাচরণই তাহাদের পতনের কারণ। যদি দেখি একই লোক বাণিজ্যে প্রচুর টাকা করিয়া ভোগে তাহা উড়াইয়া দিয়াছেন, তবে এ কথা বলিব না যে, যাহারা টাকা নষ্ট করিতে পারে, টাকা-উপার্জ্জনের পন্থা তাহারাই জানে; বরং এই কথাই বলিব টাকা রোজগার করিবার ব্যাপারে এই লোকটি হিসাবী ছিলেন, সেখানে তাঁহার সংযম ও বিবেচনাশক্তি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশি ছিল; আর টাকা উড়াইবার বেলা তাহার উড়াইবার ঝোঁক হিসাবের বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

কলাবান্ গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী, সেখানে তাঁহারা তপস্বী; সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারে না; সেখানে চিত্তের সাধনা ও সংযম আছেই। অল্প লোকই এমন পুরাপুরি বলিষ্ঠ যে, তাঁহাদের ধর্ম্মবোধকে ষোলো আনা কাজে লাগাইতে পারেন। কিছু-না-কিছু ভ্রষ্টতা আসিয়া পড়ে। কারণ, আমরা সকলেই হীনতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, চরমে আসিয়া দাঁড়াই নাই। কিন্তু জীবনে আমরা যে-কোনো স্থায়ী বড়জিনিষ গড়িয়া তুলি, তাহা আমাদের অন্তরের ধর্ম্ম-বুদ্ধির সাহায্যেই ঘটে, ভ্রষ্টতার সাহায্যে নহে। গুণী ব্যক্তিরাও যেখানে তাঁহাদের কলারচনা স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের চরিত্রই

দেখাইয়াছেন; যেখানে তাঁহাদের জীবনকে নষ্ট করিয়াছেন, সেখানে চরিত্রের অভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে, তাঁহাদের মনের ভিতরে ধর্ম্মের যে একটি সুন্দর আদর্শ আছে, রিপুর টানে তাহার বিরুদ্ধে গিয়া পীড়িত হইয়াছেন। গড়িয়া তুলিতে সংযম দরকার হয়, নষ্ট করিতে অসংযম। ধারণা করিতে সংযম চাই, আর মিথ্যা বুঝিতেই অসংযম।

এখানে কথা উঠিবে, তবেই ত একই মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যবিকাশের ক্ষমতা ও চরিত্রের অসংযম একত্রই থাকিতে থাকিতে পাকিতে পারে; তবে ত দেখি, বাঘে গোরুতে এক ঘাটেই জল খায়।

বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায় না বটে, কিন্তু সে কখন্? যখন বাঘও পূর্ত্তি পাইয়া উঠিয়াছে, গোরুও পূর্ণগোরু হইয়াছে। শিশু-অবস্থায় উভয়ে একসঙ্গে খেলা করিতেও পারে—বড় হইলে বাঘও ঝাঁপ দিয়া পড়ে, গোরুও দৌড় দিতে চেষ্টা করে।

তেম্‌নি সৌন্দর্য্যবোধের যথার্থ পরিণতভাব কখনই প্রবৃত্তির বিক্ষোভ, চিত্তের অসংযমের সঙ্গে একক্ষেত্রে টিঁকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী।

যদি বল কেন বিরোধী, তাহার কারণ আছে। বিশ্বামিত্র বিধাতার সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেটা তাঁহার ক্রোধের সৃষ্টি, দম্ভের সৃষ্টি,—সুতরাং সেই জগৎ বিধাতার জগতের সঙ্গে মিশ খাইল না—তাহাকে স্পর্দ্ধা করিয়া আঘাত করিতে লাগিল—খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া হইয়া রহিল, চরাচরের সঙ্গে সুর মিলাইতে পারিল না—অবশেষে পীড়া দিয়া পীড়া পাইয়া সেটা মরিল।

আমাদের প্রবৃত্তি উগ্র হইয়া উঠিলে বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে নিজে যেন সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন চারিদিকের সঙ্গে তাহার আর মিল খায় না। আমাদের ক্রোধ আমাদের লোভ নিজের চারিদিকে এমন সকল বিকার উৎপাদন করে, যাহাতে ছোটই বড় হইয়া উঠে, বড়ই ছোট

হইয়া যায়, যাহা ক্ষণকালের, তাহাকেই চিরকালের বলিয়া মনে হয়, যাহা চিরকালের, তাহা চোখেই পড়ে না। যাহার প্রতি আমাদের লোভ জন্মে, তাহাকে আমরা এম্নি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্রসূর্য্যতারাকে সে ম্লান করিয়া দেয়। ইহাতে আমাদের সৃষ্টি বিধাতাব সঙ্গে বিরোধ করিতে থাকে।

মনে কর নদী চলিতেছে; তাহার প্রত্যেক ঢেউ স্বতন্ত্র হইয়া মাথা তুলিলেও তাহারা সকলে মিলিয়া সেই এক সমুদ্রের দিকে গান করিতে করিতে চলিতেছে। কেহ কাহাকেও বাধা দিতেছে না। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোথাও পাক পড়িয়া যায়, তবে সেই ঘূর্ণা এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া উন্মত্তের মত ঘুরিতে থাকে,—চলিবার বাধা দিয়া ডুবাইবার চেষ্টা করে; সমস্ত নদীর যে গতি, যে অভিপ্রায়, তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইয়া সে স্থিরত্বও লাভ করে না, অগ্রসর হইতেও পারে না।

আমাদের কোন-একটা প্রবৃত্তি উন্মত্ত হইয়া উঠিলে সেও আমাদিগকে নিখিলের প্রবাহ হইতে টানিয়া-লইয়া একটা বিন্দুর উপরেই ঘুরাইয়া মারিতে থাকে। আমাদের চিত্ত সেই একটা কেন্দ্রের চারিদিকেই বাঁধা পড়িয়া তাহার মধ্যেই আপনার সমস্ত বিসর্জ্জন করিতে ও অন্যের সমস্ত নষ্ট করিতে চায়। এই উন্মত্ততার মধ্যে একদল লোক একরকমের সৌন্দর্য্য দেখে। এমন কি, আমার মনে হয়, য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই পাক-খাওয়া প্রবৃত্তির ঘূর্ণীনৃত্যের প্রলয়োৎসব,—যাহার কোনো পরিণাম নাই, যাহার কোথাও শান্তি নাই,—তাহাতেই যেন বেশি সুখ পাইয়াছে। কিন্তু ইহাকে আমরা শিক্ষার সম্পূর্ণতা বলিতে পারি না, ইহা স্বভাবের বিকৃতি। সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দেখিলে যাহাকে হঠাৎ মনোহর বলিয়া বোধ হয়, নিখিলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার সৌন্দর্য্যের বিরোধ চোখে ধরা পড়ে। মদের বৈঠকে মাতাল জগৎসংসারকে ভুলিয়া গিয়া

নিজেদের সভাকে বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া মনে করে, কিন্তু অপ্রমত্ত দর্শক চারিদিকের সংসারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার বীভৎসতা বুঝিতে পারে। আমাদের প্রবৃত্তিরও উৎপাত যখন ঘটে, তখন সে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিলাভ করিলেও বৃহৎ বিশ্বের মাঝখানে তাহাকে ধরিয়া দেখিলেই তাহার কুশ্রীতা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এম্নি করিয়া স্থির-ভাবে যে ব্যক্তি বড়র সঙ্গে ছোটকে, সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেককে মিলাইয়া দেখিতে না জানে, সে উত্তেজনাকেই আনন্দ ও বিকৃতিকেই সৌন্দর্য্য বলিয়া ভ্রম করে। এইজন্যই সৌন্দর্য্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্তি চাই; তাহা অসংযমের দ্বারা হইবার জো নাই।

সৌন্দর্য্যবোধের সম্পূর্ণতা কোন্‌দিকে চলিয়াছে, তাহাই দেখা যাক্‌।

ইহা দেখা গেছে, বর্ব্বরজাতি যাহাকে সুন্দর বলিয়া আদর করে, সভ্যজাতি তাহাকে দূরে ফেলিয়া দেয়। ইহার প্রধান কারণ, বর্ব্বরের মন যেটুকু ক্ষেত্রের মধ্যে আছে, সভ্যলোকের মন সেটুকু ক্ষেত্রের মধ্যে নাই। ভিতরে ও বাহিরে, দেশে ও কালে সভ্যজাতির জগৎটাই যে বড় এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত বিচিত্র। এইজন্যই বর্ব্বরের জগতে ও সভ্যের জগতে বস্তুর মাপ এবং ওজন এক হইতেই পারে না।

ছবিসম্বন্ধে যে ব্যক্তি আনাড়ি, সে একটা পটের উপরে খুব খানিকটা রংচং বা গোলগাল আকৃতি দেখিলেই খুসি হইয়া উঠে। ছবিকে সে বড় ক্ষেত্রে রাখিয়া দেখিতেছে না। এখানে তাহার ইন্দ্রিয়ের রাশ টানিয়া ধরিবে, এমন কোন উচ্চতর বিচারবুদ্ধি নাই। গোড়াতেই যাহা তাহাকে আহ্বান করে, তাহারই কাছে সে আপনাকে ধরা দিয়া বসে। রাজবাড়ীর দেউড়ির দরোয়ানজির চাপরাস ও চাঁপদাড়ি দেখিয়া তাহাকেই সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি মনে করিয়া সে অভিভূত হইয়া পড়ে, দেউড়ি পার হইয়া সভায় যাইবার কোনো প্রয়োজন সে অনুভব করিতেই পারে না। কিন্তু যে লোক এত বড় গ্রাম্য নহে, সে এত সহজে ভোলে না। সে জানে,

দরোয়ানের মহিমাটা হঠাৎ খুব বেশি করিয়া চোখে পড়ে বটে, কারণ চোখে পড়ার বেশি মহিমা যে তাহার নাই। রাজার মহিমা কেবলমাত্র চোখে পড়িবার বিষয় নহে, তাহাকে মন দিয়াও দেখিতে হয়। এইজন্য রাজার মহিমার মধ্যে একটা শক্তি শান্তি ও গাম্ভীর্য্য আছে।

অতএব যে ব্যক্তি সমজ্‌দার, ছবিতে সে একটা রংচঙের ঘটা দেখিলেই অভিভূত হইয়া পড়ে না। সে মুখ্যের সঙ্গে গৌণের, মাঝখানের সঙ্গে চারপাশের, সমুখের সঙ্গে পিছনের একটা সামঞ্জস্য খুঁজিতে থাকে। রংচঙে চোখ ধরা পড়ে, কিন্তু সামঞ্জস্যের সুষমা দেখিতে মনের প্রয়োজন। তাহাকে গভীরভাবে দেখিতে হয়, এইজন্য তাহার আনন্দ গভীরতর।

এই কারণে অনেক গুণী দেখা যায়,—বাহিরের ক্ষুদ্র লালিত্যকে যাঁহারা আমল দিতে চান না; তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে যেন একটা কঠোরতা আছে। তাঁহাদের ধ্রুপদের মধ্যে খেয়ালের তান নাই। হঠাৎ তাহার বাহিরের রিক্ততা দেখিয়া ইতর লোকে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে; অথচ সেই নির্ম্মল রিক্ততার গভীরতর ঐশ্বর্য্যই বিশিষ্টলোকের চিত্তকে বৃহৎ আনন্দ দান করে।

তবেই দেখা যাইতেছে, শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টি যোগ না দিলে সৌন্দর্য্যকে বড় করিয়া দেখা যায় না। এই মনের দৃষ্টি লাভ করা বিশেষ শিক্ষার কর্ম্ম।

মনেরও আবার অনেক স্তর আছে। কেবল বুদ্ধিবিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে হৃদয়ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরো বাড়িয়া যায়—ধর্ম্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরো অনেকদূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টিক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।

অতএব যে দেখাতে আমাদের মনের বড় অংশ অধিকার করে, সেই দেখাতেই আমরা বেশি তৃপ্তি পাই। ফুলের সৌন্দর্য্যের চেয়ে মানুষের মুখ আমাদিগকে বেশি টানে, কেন না, মানুষের মুখে শুধু আকৃতির সুষমা

নয়, তাহাতে চেতনার দীপ্তি, বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি, হৃদয়ের লাবণ্য আছে; তাহা আমাদের চৈতন্যকে, বুদ্ধিকে, হৃদয়কে দখল করিয়া বসে। তাহা আমাদের আছে শীঘ্র ফুরাইতে চায় না।)

আবার মানুষের মধ্যে যাঁহারা নরোত্তম, ধরাতলে যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের প্রকাশ, তাঁহারা আমাদের মনের এতদূর পর্য্যন্ত টান দেন, সেখানে আমরা নিজেরাই নাগাল পাই না। এইজন্য যে-রাজপুত্র মানুষের দুঃখমোচনের উপায়চিন্তা করিতে রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার মনোহারিতা মানুষকে কত কাব্য, কত চিত্ররচনায় লাগাইয়াছে, তাহার সীমা নাই।

এইখানে সন্দিগ্ধ লোকেরা বলিবেন, সৌন্দর্য্য হইতে যে ধর্ম্মনীতির কথা আসিয়া পড়িল! দুটোতে ঘোলাইয়া দিবার দরকার কি! যাহা ভালো, তাহা ভালো এবং যাহা সুন্দর, তাহা সুন্দর। ভালো আমাদের মনকে একরকম করিয়া টানে, সুন্দর আমাদের মনকে আর একরকম করিয়া টানে—উভয়ের আকর্ষণ-প্রণালীর বিভিন্নতা আছে বলিয়াই ভাষায় দুটোকে দুই নাম দিয়া থাকে। যাহা ভালো তাহার প্রয়োজনীয়তা আমাদিগকে মুগ্ধ করে, আর যাহা সুন্দর, তাহা যে কেন মুগ্ধ করে, সে আমরা জানি না।

এ সম্বন্ধে আমার বলিবার একটা কথা এই যে, মঙ্গল আমাদের ভাল করে বলিয়াই যে তাহাকে আমরা ভাল বলি, ইহা বলিলে সবটা বলা হয় না। যথার্থ যে মঙ্গল, তাহা আমাদের প্রয়োজনসাধন করে এবং তাহা সুন্দর;—অর্থাৎ প্রয়োজনসাধনের ঊর্দ্ধেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে। নীতিপণ্ডিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক্ হইতে নীতি উপদেশ দিয়া মঙ্গলপ্রচার করিতে চেষ্টা করেন এবং কবিরা মঙ্গলকে তাহার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যমূর্ত্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বস্তুত মঙ্গল যে সুন্দর, সে আমাদের প্রয়োজনসাধন করে বলিয়া নহে। ভাত আমাদের কাজে লাগে, কাপড় আমাদের কাজে লাগে, ছাতা-জুতা আমাদের কাজে লাগে; ভাতকাপড়-ছাতাজুতা আমাদের মনে সৌন্দর্য্যের পুলক সঞ্চার করে না। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গেলেন, এই সংবাদে আমাদের মনের মধ্যে বীণার তারে যেন একটা সঙ্গীত বাজাইয়া তোলে। ইহা সুন্দর ভাষাতেই, সুন্দর ছন্দেই সুন্দর করিয়া সাজাইয়া স্থায়ী করিয়া রাখিবার বিষয়। ছোট ভাই বড় ভাইয়ের সেবা করিলে সমাজের হিত হয় বলিয়া যে এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে, ইহা সুন্দর বলিয়াই। কেন সুন্দর? কারণ, মঙ্গলমাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে। সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের সেই পূর্ণসামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই তাহার সৌন্দর্য্য আর আমাদের অগোচর থাকে না। করুণা সুন্দর, ক্ষমা সুন্দর, প্রেম সুন্দর;—শতদলপদ্মের সঙ্গে, পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তাহার তুলনা হয়; শতদলপদ্মের মত, পূর্ণিমার চাঁদের মত নিজের মধ্যে এবং চারিদিকের জগতের মধ্যে তাহার একটি বিরোধহীন সুষমা আছে;—সে নিখিলের অনুকূল এবং নিখিল তাহার অনুকূল। আমাদের পুরাণে লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের দেবী নহেন, তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্য্যমূর্ত্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্ত্তি এবং মঙ্গলমূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যের পূর্ণস্বরূপ।

সৌন্দর্য্যে ও মঙ্গলে যে জায়গায় মিল আছে, সে জায়গাটা বিচার করিয়া দেখা যাক্।

আমরা প্রথমেই দেখাইয়াছি, সৌন্দর্য্য প্রয়োজনের বাড়া। এইজন্য তাহাকে আমরা ঐশ্বর্য্য বলিয়া মানি। এইজন্য তাহা আমাদিগকে নিছক স্বার্থসাধনের দারিদ্র্য হইতে প্রেমের মধ্যে মুক্তি দেয়।

মঙ্গলের মধ্যেও আমরা সেই ঐশ্বর্য্য দেখি। যখন দেখি, কোনো

বীরপুরুষ ধর্ম্মের জন্য স্বার্থ ছাড়িয়াছেন, প্রাণ দিয়াছেন, তখন এমন একটা আশ্চর্য্য পদার্থ আমাদের চোখে পড়ে, যাহা আমাদের সুখদুঃখের চেয়ে বেশি, আমাদের স্বার্থের চেয়ে বড়, আমাদের প্রাণের চেয়ে মহৎ। মঙ্গল নিজের এই ঐশ্বর্য্যের জোরে ক্ষতি ও ক্লেশকে ক্ষতি ও ক্লেশ বলিয়া গণ্যই করে না। স্বার্থের ক্ষতিতে তাহার ক্ষতি হইবার জো নাই। এইজন্য সৌন্দর্য্য যেমন আমাদিগকে স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগে প্রবৃত্ত করে, মঙ্গলও সেইরূপ করে। সৌন্দর্য্য জগদ্ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করে, মঙ্গলও মানুষের জীবনের মধ্যে তাহাই করিয়া থাকে; মঙ্গল, সৌন্দর্য্যকে শুধু চোখের দেখা নয়, শুধু বুদ্ধির বোঝা নয়, তাহাকে আরো ব্যাপক, আরো গভীর করিয়া মানুষের কাছে আনিয়া দিয়াছে, তাহা ঈশ্বরের সামগ্রীকে অত্যন্তই মানুষের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত মঙ্গল মানুষের নিকটবর্ত্তী অন্তরতর সৌন্দর্য্য, এইজন্যই তাহাকে আমরা অনেকসময় সহজে সুন্দর বলিয়া বুঝিতে পারি না—কিন্তু যখন বুঝি, তখন আমাদের প্রাণ বর্ষার নদীর মত ভরিয়া উঠে। তখন আমরা তাহার চেয়ে রমণীয় আর কিছুই দেখি না।

ফুলপাতা, প্রদীপের মালা এবং সোনারূপার থালি দিয়া যদি ভোজের জায়গা সাজাইতে পার, সে ত ভালই, কিন্তু নিমন্ত্রিত যদি যজ্ঞকর্ত্তার কাছ হইতে সমাদর না পায়,—হৃদ্যতা না পায়, তবে সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য তাহার কাছে রোচে না, কারণ এই হৃদ্যতাই অন্তরের ঐশ্বর্য্য, অন্তরের প্রাচুর্য্য। হৃদ্যতার মিষ্টহাস্য, মিষ্টবাক্য, মিষ্টব্যবহার এমন সুন্দর যে, তাহা কলার পাতাকেও সোনার থালার চেয়ে বেশি মূল্য দেয়। সকলের কাছেই যে দেয়, এ কথাও বলিতে পারি না। বহু আড়ম্বরের ভোজে অপমানস্বীকার করিয়াও প্রবেশ করিতে প্রস্তুত, এমন লোকও অনেক দেখা যায়। কেন দেখা যায়? কারণ, ভোজের বড় তাৎপর্য্য, বৃহৎ সৌন্দর্য্য সে বোঝে না। বস্তুত খাওয়াটা বা সজ্জাটাই

ভোজের প্রধান অঙ্গ নহে। কুঁড়ির পাপ্‌ড়িগুলি যেমন নিজের মধ্যেই কুঞ্চিত, তেম্‌নি স্বার্থরত মানুষের শক্তি নিজের দিকেই চিরদিন সঙ্কুচিত, একদিন তাহার বাঁধন ঢিলা করিয়া তাহাকে পরাভিমুখ করিবামাত্র ফোটাফুলের মত বিশ্বের দিকে তাহার মিলনমাধুর্য্যময় অতি সুন্দর বিস্তার ঘটে—যজ্ঞের সেই ভিতরদিকটার গভীরতর মঙ্গলসৌন্দর্য্য যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না, তাহার কাছে ভোজ্যপেয়ের প্রাচুর্য্য ও সাজসজ্জার আড়ম্বরই বড় হইয়া উঠে। তাহার অসংযত প্রবৃত্তি, তাহার দানদক্ষিণা-পানভোজনের অতিমাত্র লোভ যজ্ঞের উদার মাধুর্য্যকে ভাল করিয়া দেখিতে দেয় না।

শাস্ত্রে বল, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমাই শক্তিমানের ভূষণ। কিন্তু ক্ষমাপ্রকাশের মধ্যেই শক্তির সৌন্দর্য্য-অনুভব ত সকলের কর্ম্ম নহে। বরঞ্চ সাধারণ মূঢ়লোকেরা শক্তির উপদ্রব দেখিলেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধা-বোধ করে। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। কিন্তু সাজসজ্জার চেয়ে এই লজ্জার সৌন্দর্য্য কে দেখিতে পায়? যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্যকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখে না। সঙ্কীর্ণ প্রকাশের তরঙ্গভঙ্গ যখন বিস্তীর্ণ প্রকাশের মধ্যে শান্ত হইয়া গেছে, তখন সেই বড় সৌন্দর্য্যকে দেখিতে হইলে উচ্চভূমি হইতে প্রশস্তভাবে দেখা চাই। তেমন করিয়া দেখার জন্য মানুষের শিক্ষা চাই, গাম্ভীর্য্য চাই, অন্তরের শান্তি চাই।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা গর্ভিণী নারীর সৌন্দর্য্যবর্ণনায় কোথাও কুণ্ঠাপ্রকাশ করেন নাই। য়ুরোপের কবি এখানে একটা লজ্জা ও দীনতা বোধ করেন। বস্তুত গর্ভিণী রমণীর যে কান্তি, সেটাতে চোখের উৎসব তেমন নাই। নারীত্বের চরম সার্থকতালাভ যখন আসন্ন হইয়া আসে, তখন তাহারই প্রতীক্ষা নারীমূর্ত্তিকে গৌরবে ভরিয়া তোলে। এই দৃশ্যে চোখের বিলাসে যেটুকু কম পড়ে মনের ভক্তিতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। সমস্ত বৃষ্টি ঝরিয়া-পড়িয়া

শরতের যে হাল্কা মেঘ বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগাইয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহার উপরে যখন অস্তসূর্য্যের আলো পড়ে, তখন রঙের ছটায় চোখ ধাঁধিয়া যায়। কিন্তু আষাঢ়ের যে নূতন ঘন মেঘ পয়স্বিনী কালো গাভীটির মত আসন্ন বৃষ্টির ভারে একেবারে মন্থর হইয়া পড়িয়াছে; যাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলতার মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্যের চাপল্য কোথাও নাই, সে আমাদের মনকে চারিদিক্ হইতে এমন করিয়া ঘনাইয়া ধরে যে, কোথাও যেন কিছু ফাঁক রাখে না। ধরণীর তাপশান্তি, শস্যক্ষেত্রের দৈন্যনিবৃত্তি, নদীসরোবরের কৃশতামোচনের উদার আশ্বাস তাহার স্নিগ্ধ নীলিমার মধ্যে যে মাখানো; মঙ্গলময় পরিপূর্ণতার গম্ভীর মাধুর্য্যে সে স্তব্ধ হইয়া থাকে। কালিদাস ত বসন্তের বাতাসকে বিরহী যক্ষের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। এ কার্য্যে তাহার হাতযশ আছে বলিয়া লোকে রটনা করে; বিশেষত উত্তরে যাইতে হইলে দক্ষিণাবাতাসকে কিছুমাত্র উজানে যাইতে হইত না। কিন্তু কবি প্রথম-আষাঢ়ের নূতন মেঘকেই পছন্দ করিলেন—সে যে জগতের তাপ নিবারণ করে—সে কি শুধু প্রণয়ীর বার্ত্তা প্রণয়িনীর কানের কাছে প্রলপিত করিবে? সে যে সমস্ত পথটার নদী-গিরি-কাননের উপর বিচিত্র পূর্ণতার সঞ্চার করিতে করিতে যাইবে। কদম্ব ফুটিবে, জম্বুকুঞ্জ ভরিয়া উঠিবে, বলাকা উড়িয়া চলিবে, ভরা নদীর জল ছল্‌ছল্ করিয়া তাহার কূলের বেত্রবনে আসিয়া ঠেকিবে এবং জনপদবধূর ভ্রূবিলাসহীন প্রীতিস্নিগ্ধলোচনের দৃষ্টিপাতে আষাঢ়ের আকাশ যেন আরো জুড়াইয়া যাইবে। বিরহীর বার্ত্তাপ্রেরণকে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলব্যাপারের সঙ্গে পদে-পদে গাঁথিয়া-গাঁথিয়া তবে কবির সৌন্দর্য্যরসপিপাসু চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছে।

কুমারসম্ভবের কবি অকালবসন্তের আকস্মিক উৎসবে, পুষ্পশরের মোহবর্ষণের মধ্যে হরপার্ব্বতীর মিলনকে চূড়ান্ত করিয়া তোলেন নাই। স্ত্রীপুরুষের উন্মত্ত সংঘাত হইতে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেই

প্রলয়াগ্নিতে আগে তিনি শান্তিধারা বর্ষণ করিয়াছেন, তবে ত মিলনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন। কবি গৌরীর প্রেমের সর্ব্বাপেক্ষা কমনীয়মূর্ত্তি তপস্যার অগ্নির দ্বারাই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। সেখানে বসন্তের পুষ্পসম্পদ্ ম্লান, কোকিলের মুখরতা শুব্ধ। অভিজ্ঞান-শকুন্তলেও প্রেয়সী যেখানে জননী হইয়াছেন, বাসনার চাঞ্চল্য যেখানে বেদনার তপস্যায় গাম্ভীর্য্যলাভ করিয়াছে, যেখানে অনুতাপের সঙ্গে ক্ষমা আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানেই রাজদম্পতির মিলন সার্থক হইয়াছে। প্রথম মিলনে প্রলয়, দ্বিতীয় মিলনেই পরিত্রাণ। এই দুই কাব্যেই শান্তির মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে যেখানেই কবি সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন, সেখানেই তাঁহার তুলিকা বর্ণবিরল, তাঁহার বীণা অপ্রমত্ত।

বস্তুত সৌন্দর্য্য যেখানেই পরিণতিলাভ করিয়াছে, সেখানেই সে আপনার প্রগল্‌ভতা দূর করিয়া দিয়াছে। সেখানেই ফুল আপনার বর্ণগন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্য্যে পরিণত করিয়াছে; সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্য্যের সহিত মঙ্গল একাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখিয়াছে, সে ভোগবিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্য্যকে কখনই জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাহার জীবন-যাত্রার উপকরণ শাদাসিধা হইয়া থাকে; সেটা সৌন্দর্য্যবোধের অভাব হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হয়। অশোকের প্রমোদ-উদ্যান কোথায় ছিল? তাঁহার রাজবাটীর ভিতের কোনো চিহ্নও ত দেখিতে পাই না। কিন্তু অশোকের রচিত স্তূপ ও স্তম্ভ বুদ্ধগয়ায় বোধিবটমূলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামান্য নহে। যে পুণ্যস্থানে ভগবান্ বুদ্ধ মানবের দুঃখ-নিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই কলাসৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজের ভোগকে এই পূজার অর্ঘ্য তিনি এমন করিয়া দেন নাই। এই ভারতবর্ষে কত দুর্গম গিরিশিখরে, কত

নির্জ্জন সমুদ্রতীরে কত দেবালয়, কত কলাশোভন পুণ্যকীর্ত্তি দেখিতে পাই, কিন্তু হিন্দুরাজাদের বিলাসভবনের স্মৃতিচিহ্ন কোথায় গেল? রাজধানী-নগর ছাড়িয়া অরণ্যপর্ব্বতে এই সমস্ত সৌন্দর্য্যস্থাপনার কারণ কি? কারণ আছে! সেখানে মানুষ নিজের সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দ্বারা নিজের চেয়ে বড়র প্রতিই বিস্ময়পূর্ণ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছে। মানুষের রচিত সৌন্দর্য্য দাঁড়াইয়া আপনার চেয়ে বড় সৌন্দর্য্যকে দুই হাত তুলিয়া অভিবাদন করিতেছে; নিজের সমস্ত মহত্ত্ব দিয়া নিজের চেয়ে মহত্তরকেই নীরবে প্রচার করিতেছে। মানুষ এই সকল কারুপরিপূর্ণ নিস্তব্ধভাষার দ্বারা বলিয়াছে—দেখ, চাহিয়া দেখ, যিনি সুন্দর তাঁহাকে দেখ, যিনি মহান্ তাঁহাকে দেখ! সে এ কথা বলিতে চাহে নাই যে, আমি কত বড় ভোগী, সেইটে দেখিয়া লও! সে বলে নাই, জীবিত অবস্থায় আমি যেখানে বিহার করিতাম সেখানে চাও, মৃত অবস্থায় আমি যেখানে মাটিতে মিশাইয়াছি সেখানেও আমার মহিমা দেখ। জানি না, প্রাচীন হিন্দুরাজারা নিজেদের প্রমোদভবনকে তেমন করিয়া অলঙ্কৃত করিতেন কি না; অন্তত ইহা নিশ্চয় যে, হিন্দুজাতি সেগুলিকে সমাদর করিয়া রক্ষা করে নাই;—যাহাদের গৌরবপ্রচারের জন্য তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাদের সঙ্গেই আজ সে সমস্ত ধূলায় মিশাইয়াছে! কিন্তু মানুষের শক্তি, মানুষের ভক্তি যেখানে নিজের সৌন্দর্য্যরচনাকে ভগবানের মঙ্গলরূপের বামপার্শ্বে বসাইয়া ধন্য হইয়াছে, সেখানে সেই মিলনমন্দিরগুলিকে অতি দুর্গমস্থানেও আমরা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। মঙ্গলের সঙ্গেই সৌন্দর্য্যের, বিষ্ণুর সঙ্গেই লক্ষ্মীর মিলন পূর্ণ। সকল সভ্যতার মধ্যেই এই ভাবটি প্রচ্ছন্ন আছে। একদিন নিশ্চয় আসিবে, যখন সৌন্দর্য্য ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা বদ্ধ, ঈর্ষার দ্বারা বিদ্ধ, ভোগের দ্বারা জীর্ণ হইবে না শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে নির্ম্মলভাবে স্ফূর্ত্তি পাইবে। সৌন্দর্য্যকে আমাদের বাসনা হইতে, লোভ হইতে স্বতন্ত্র

করিয়া না দেখিতে পাইলে তাহাকে পূর্ণভাবে দেখা হয় না। সেই অশিক্ষিত অসংযত অসম্পূর্ণ দেখায় আমরা যাহা দেখি, তাহাতে আমাদিগকে তৃপ্তি দেয় না, তৃষ্ণাই দেয়; খাদ্য দেয় না, মদ খাওয়াইয়া আহারের স্বাস্থ্যকর অভিরুচি পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে থাকে।

এই আশঙ্কাবশতই নীতিপ্রচারকেরা সৌন্দর্য্যকে দূর হইতে নমস্কার করিতে উপদেশ দেন। পাছে লোকসান হয় বলিয়া লাভের পথ মাড়াইতেই নিষেধ করেন। কিন্তু যথার্থ উপদেশ এই যে, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অধিকার পাইব বলিয়াই সংযমসাধন করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য সেইজন্যই—পরিণামে শুষ্কতালাভের জন্য নহে।

সাধনার কথা যখন উঠিল, তখন প্রশ্ন হইতে পারে, এ সাধনার সিদ্ধি কি? ইহার শেষ কোন্‌খানে? আমাদের অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি, কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধ কিসের জন্য আমাদের মনে স্থান পাইয়াছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সৌন্দর্য্যবোধের রাস্তাটা কোন্‌দিকে চলিয়াছে, সে কথাটার আর একবার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সৌন্দর্য্যবোধ যখন শুদ্ধমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লয়, তখন যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি, তাহা খুবই স্পষ্ট, তাহা দেখিবামাত্রই চোখে ধরা পড়ে। সেখানে আমাদের সমুখে একদিকে সুন্দর ও আর-একদিকে অসুন্দর, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট। তার পরে বুদ্ধিও যখন সৌন্দর্য্যবোধের সহায় হয়, তখন সুন্দর অসুন্দরের ভেদটা দূরে গিয়া পড়ে। তখন যে জিনিষ আমাদের মনকে টানে, সেটা হয় ত চোখ মেলিবামাত্রই দৃষ্টিতে পড়িবার যোগ্য বলিয়া মনে না হইতেও পারে। আরম্ভের সহিত শেষের, প্রধানের সহিত অপ্রধানের, এক অংশের সহিত অন্য অংশের গূঢ়তর সামঞ্জস্য দেখিয়া যেখানে আমরা

আনন্দ পাই, সেথানে আমরা চোখভুলানো সৌন্দর্য্যের দাসখত তেমন করিয়া আর মানি না। তার পরে কল্যাণবুদ্ধি যেথানে যোগ দেয়, সেথানে আমাদের মর্নের অধিকার আরো বাড়িয়া যায়, সুন্দর অসুন্দরের দ্বন্দ্ব আরো ঘুচিয়া যায়। সেথানে কল্যাণী সতী সুন্দর হইয়া দেখা দেন, কেবল রূপসী নহে। যেথানে ধৈর্য্য-বীর্য্য ক্ষমা প্রেম আলো ফেলে সেথানে রংচঙের আয়োজন আড়ম্বরের কোনো প্রয়োজনই আমরা বুঝি না। কুমারসম্ভবকাব্যে ছদ্মবেশী মহাদেব তাপসী উমার নিকট শঙ্করের রূপগুণবয়সবিভবের নিন্দা করিলেন, তথন উমা কহিলেন, "মমাত্র ভাবৈক রসং মনঃস্থিতম্"—তাঁহার প্রতি আমার মন একমাত্র ভাবের রসে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং আনন্দের জন্য আর কোনো উপকরণের প্রয়োজনই নাই। ভাব-রসে সুন্দর-অসুন্দরের কঠিন বিচ্ছেদ দূরে চলিয়া যায়।

তবু মঙ্গলের মধ্যেও একটা দ্বন্দ্ব আছে। মঙ্গলের বোধ ভাল মন্দের একটা সংঘাতের অপেক্ষা রাথে। কিন্তু এমনতর দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছুর পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। পরিণাম এক বই দুই নহে। নদী যতক্ষণ চলে, ততক্ষণ তাহার দুই কূলের প্রয়োজন হয়, কিন্তু যেথানে তাহার চলা শেষ হয়, সেথানে একমাত্র অকূল সমুদ্র। নদীর চলার দিক্‌টাতে দ্বন্দ্ব, সমাপ্তির দিক্‌টাতে দ্বন্দ্বের অবসান। আগুন জ্বালাইবার সময় দুই কাঠে ঘষিতে হয়, শিখা যথন জ্বলিয়া উঠে, তথন দুই কাঠের ঘর্ষণ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সৌন্দর্য্যবোধও সেইরূপ। ইন্দ্রিয়ের সুথকর ও অসুথকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে, তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়।

তথন কি হয়? তথন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া-গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তথন

সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের যথার্থ উপলব্ধি মাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য্য।

এই চঞ্চল সংসারে আমরা সত্যের আস্বাদ কোথায় পাই? যেখানে আমাদের মন বসে। রাস্তার লোক আসিতেছে যাইতেছে, তাহারা আমাদের কাছে ছায়া, তাহাদের উপলব্ধি আমাদের কাছে নিতান্ত ক্ষীণ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নাই। বন্ধুর সত্য আমাদের কাছে গভীর, সেই সত্য আমাদের মনকে আশ্রয় দেয়; বন্ধুকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি, সে আমাদিগকে ততখানি আনন্দ দেয়। যে দেশ আমার নিকট ভূবৃত্তান্তের অন্তর্গত একটা নামমাত্র, সে দেশের লোক সে দেশের জন্য প্রাণ দেয়। তাহারা দেশকে অত্যন্ত সত্যরূপে জানিতে পারে বলিয়াই তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে। মূঢ়ের কাছে যে বিদ্যা বিভীষিকা, বিদ্বানের কাছে তাহা পরমানন্দের জিনিষ, বিদ্বান্ তাহা লইয়া জীবন কাটাইয়া দিতেছে। তবেই দেখা যাইতেছে, যেখানেই আমাদের কাছে সত্যের উপলব্ধি, সেইখানেই আমরা আনন্দকে দেখিতে পাই। সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিই আনন্দের অভাব। কোনো সত্যে যেখানে আমাদের আনন্দ নাই, সেখানে আমরা সেই সত্যকে জানি মাত্র, তাহাকে পাই না। যে সত্য আমার কাছে নিরতিশয় সত্য তাহাতেই আমার প্রেম, তাহাতেই আমার আনন্দ।

এইরূপে বুঝিলে সত্যের অনুভূতি ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি এক হইয়া দাঁড়ায়।

মানবের সমস্ত সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলা জানিয়া এবং না জানিয়া এইদিকেই চলিতেছে। মানুষ তাহার কাব্যে, চিত্রে, শিল্পে সত্যমাত্রকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে। পূর্ব্বে যাহা চোখে পড়িত না বলিয়া আমাদের কাছে অসত্য ছিল, কবি তাহাকে আমাদের দৃষ্টির সাম্নে আনিয়া আমাদের সত্যের রাজ্যের, আনন্দের রাজ্যের সীমানা বাড়াইয়া দিতে-

ছেন। সমস্ত তুচ্ছকে, অনাদৃতকে মানুষের সাহিত্য প্রতিদিন সত্যের গৌরবে আবিষ্কার করিয়া কলাসৌন্দর্য্যে চিহ্নিত করিতেছে। যে কেবলমাত্র পরিচিত ছিল, তাহাকে বন্ধু করিয়া তুলিতেছে। যাহা কেবলমাত্র চোখে পড়িত, তাহার উপরে মনকে টানিতেছে।

আধুনিক কবি বলিয়াছেন, "Truth is beauty, beauty truth" —আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে "Truth" এবং "Beauty" মূর্ত্তিমতী। উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন—"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি", যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমস্তই truth এবং সমস্তই beauty, সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্।

সত্যের এই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্যসাহিত্যের লক্ষ্য। সত্যকে যখন শুধু আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই, তখন নয়, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই, তখনি তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি। তবে কি সাহিত্য কলাকৌশলের সৃষ্টি নহে, তাহা কেবল হৃদয়ের আবিষ্কার? ইহার মধ্যে সৃষ্টিরও একটা ভাগ আছে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কে, সেই আবিষ্কারের আনন্দকে হৃদয় আপনার ঐশ্বর্য্যদ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে—ইহাতেই সৃষ্টিনৈপুণ্য—ইহাই সাহিত্য, ইহাই সঙ্গীত, ইহাই চিত্রকলা।

মরুভূমির বালুময় বিস্তারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মানুষ তাহাকে দুই পিরামিডের বিস্ময়চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছে; নির্জ্জন দ্বীপের সমুদ্রতটকে মানুষ পাহাড়ের গায়ে কারুকৌশলপূর্ণ গুহা খুদিয়া চিহ্নিত করিয়াছে, বলিয়াছে, ইহা আমার হৃদয়কে তৃপ্ত করিল; এই চিহ্নই বম্বাইয়ের হস্তিগুহা। পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া মানুষ সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্যোদয়ের

মহিমা দেখিল, অমনি বহুশতক্রোশ দূর হইতে পাথর আনিয়া সেখানে আপনার করজোড়ের চিহ্ন রাখিয়া দিল, তাহাই কণারকের মন্দির। সত্যকে যেখানে মানুষ নিবিড়রূপে অর্থাৎ আনন্দরূপে, অমৃতরূপে উপলব্ধি করিয়াছে, সেইখানেই আপনার একটা চিহ্ন কাটিয়াছে। সেই চিহ্নই কোথাও বা মূর্ত্তি, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা তীর্থ, কোথাও বা রাজধানী। সাহিত্যও এই চিহ্ন। বিশ্বজগতের যে-কোনো ঘাটেই মানুষের হৃদয় আসিয়া ঠেকিতেছে, সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটা স্থায়ী তীর্থ বাঁধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে—এম্‌নি করিয়া বিশ্বতটের সকল স্থানকেই সে মানবযাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য, উত্তরণ-যোগ্য করিয়া তুলিতেছে। এম্‌নি করিয়া মানুষ জলে-স্থলে-আকাশে, শরতে-বসন্তে-বর্ষায়, ধর্ম্মে-কর্ম্মে-ইতিহাসে অপরূপ চিহ্ন কাটিয়া-কাটিয়া সত্যের সুন্দর মূর্ত্তির প্রতি মানুষের হৃদয়কে নিয়ত আহ্বান করিতেছে। দেশে-দেশে কালে-কালে এই চিহ্ন, এই আহ্বান কেবলি বিস্তৃত হইয়া চলিতেছে। জগতে সর্ব্বত্রই মানুষ সাহিত্যের দ্বারা হৃদয়ের এই চিহ্নগুলি যদি না কাটিত, তবে জগৎ আমাদের কাছে আজ কত সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকিত, তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। আজ এই চোখে-দেখা কানে-শোনা জগৎ যে বহুলপরিমাণে আমাদের হৃদয়ের জগৎ হইয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রধান কারণ মানুষের সাহিত্য হৃদয়ের আবিষ্কারচিহ্নে জগৎকে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কার্য্য-কারণপরম্পরা, সে কথা জানাইবার অন্য শাস্ত্র আছে—কিন্তু সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।" তিনিই রস; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।

১৩১৩।

বিশ্বসাহিত্য।

আমাদের অন্তঃকরণে যত-কিছু বৃত্তি আছে, সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নহিলে আমি আছি বা কিছু আছে, ইহার অর্থই থাকে না।

জগতে সত্যের সঙ্গে আমাদের এই যে যোগ, ইহা তিন প্রকারের। বুদ্ধির যোগ, প্রয়োজনের যোগ, আর আনন্দের যোগ। ইহার মধ্যে বুদ্ধির যোগকে একপ্রকার প্রতিযোগিতা বলা যাইতে পারে। সে যেন ব্যাধের সঙ্গে শিকারের যোগ। সত্যকে বুদ্ধি যেন প্রতিপক্ষের মত নিজের রচিত একটা কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জেরা করিয়া করিয়া তাহার পেটের কথা টুক্‌রা-টুকরা ছিনিয়া বাহির করে। এইজন্য সত্য-সম্বন্ধে বুদ্ধির একটা অহঙ্কার থাকিয়া যায়। সে যে পরিমাণে সত্যকে জানে, সেই পরিমাণে আপনার শক্তিকে অনুভব করে। তার পরে প্রয়োজনের যোগ। এই প্রয়োজনের অর্থাৎ কাজের যোগে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির একটা সহযোগিতা জন্মে। এই গরজের সম্বন্ধে সত্য আরো বেশি করিয়া আমাদের কাছে আসে। কিন্তু তবু তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য ঘোচে না। ইংরেজসওদাগর যেমন একদিন নবাবের কাছে মাথা নীচু করিয়া ভেট দিয়া কাজ আদায় করিয়া লইয়াছিল এবং কৃতকার্য্য হইয়া শেষকালে নিজেই সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছে—তেম্‌নি সত্যকে ব্যবহারে লাগাইয়া কাজ উদ্ধার করিয়া শেষকালে মনে করি, আমরাই যেন জগতের বাদশাগিরি পাইয়াছি! তখন আমরা বলি, প্রকৃতি আমাদের দাসী, জল বায়ু-অগ্নি আমাদের বিনা-বেতনের চাকর।

তার পরে আনন্দের যোগ। এই সৌন্দর্য্যের বা আনন্দের যোগে সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া যায়—সেখানে আর অহঙ্কার থাকে না—সেখানে নিতান্ত ছোটর কাছে, দুর্ব্বলের কাছে আপনাকে একেবারে সঁপিয়া দিতে আমাদের কিছুই বাধে না। সেখানে মথুরার রাজা বৃন্দাবনের গোয়ালিনীর কাছে আপনার রাজমর্য্যাদা লুকাইবার আর পথ পায় না। যেখানে আমাদের আনন্দের যোগ, সেখানে আমাদের বুদ্ধির শক্তিকেও অনুভব করি না—কর্ম্মের শক্তিকেও অনুভব করি না—সেখানে শুদ্ধ আপনাকেই অনুভব করি,—মাঝখানে কোনো আড়াল বা হিসাব থাকে না।

এক কথায়, সত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ আমাদের ইস্কুল, প্রয়োজনের যোগ আমাদের আপিস্, আনন্দের যোগ আমাদের ঘর। ইস্কুলেও আমরা সম্পূর্ণভাবে থাকি না, আপিসেও আমরা সম্পূর্ণভাবে ধরা দিই না, ঘরেই আমরা বিনা বাধায় নিজের সমস্তটাকে ছাড়িয়া-দিয়া বাঁচি। ইস্কুল নিরলঙ্কার, আপিস্ নিরাভরণ, আর ঘরকে কত সাজসজ্জায় সাজাইয়া থাকি।

এই আনন্দের যোগ ব্যাপারখানা কি? না, পরকে আপনার করিয়া জানা, আপনাকে পরের করিয়া জানা। যখন তেমন করিয়া জানি, তখন কোনো প্রশ্ন থাকে না। এ কথা আমরা কখনো জিজ্ঞাসা করি না যে, আমি আমাকে কেন ভালবাসি, আমার আপনার অনুভূতিতেই যে আনন্দ। সেই আমার অনুভূতিকে অন্যের মধ্যেও যখন পাই, তখন এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার কোনো প্রয়োজনই হয় না যে, তাহাকে আমার কেন ভাল লাগিতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিয়াছিলেন—

"নবা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।
নবা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।"

পুত্রকে চাহি বলিয়াই যে পুত্র প্রিয় হয়, তাহা নহে, আত্মাকে চাহি বলিয়াই পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তকে চাহি বলিয়াই যে বিত্ত প্রিয় হয়, তাহা নহে, আত্মাকে চাহি বলিয়াই বিত্ত প্রিয় হয়, ইত্যাদি।

এ কথার অর্থ এই, যাহার মধ্যে আমি নিজেকেই পূর্ণতর বলিয়া বুঝিতে পারি, আমি তাহাকেই চাই। পুত্র আমার অভাব দূর করে—তাহার মানে, আমি পুত্রের মধ্যে আমাকে আরো পাই। তাহার মধ্যে আমি যেন আমিতর হইয়া উঠি। এইজন্য সে আমার আত্মীয়; আমার আত্মাকে আমার বাহিরেও সে সত্য করিয়া তুলিয়াছে। নিজের মধ্যে যে সত্যকে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়া প্রেম অনুভব করি, পুত্রের মধ্যেও সেই সত্যকে সেই-মতই অত্যন্ত অনুভব করাতে আমার সেই প্রেম বাড়িয়া উঠে। সেইজন্য একজন মানুষ যে কি, তাহা জানিতে গেলে সে কি ভালবাসে, তাহা জানিতে হয়। ইহাতেই বুঝা যায়, এই বিশ্বজগতে কিসের মধ্যে সে আপনাকে লাভ করিয়াছে, কত-দূর পর্য্যন্ত সে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছে। যেখানে আমার প্রীতি নাই, সেখানেই আমাব আত্মা তাহার গণ্ডির সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শিশু বাহিরে আলো দেখিলে বা কিছু একটা চলাফেরা করিতেছে দেখিলে আনন্দে হাসিয়া উঠে, কলরব করে। সে এই আলোকে, এই চাঞ্চল্যে আপনারই চেতনাকে অধিকতর করিয়া পায়—এইজন্যই তাহার আনন্দ।

কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ ছাড়াও ক্রমে যখন তাহার চেতনা হৃদয়মনের নানা স্তরে ব্যাপ্ত হইতে থাকে, তখন শুধু এতটুকু আন্দোলনে তাহার আনন্দ হয় না। একেবারে হয় না, তাহা নহে, অল্প হয়।

এম্‌নি করিয়া মানুষের বিকাশ যতই বড় হয়, সে ততই বড়-রকম করিয়া আপনার সত্যকে অনুভব করিতে চায়।

এই যে নিজের অন্তরাত্মাকে বাহিরে অনুভব করা, এটা প্রথমে মানুষের মধ্যেই মানুষ অতি সহজে এবং সম্পূর্ণরকমে করিতে পারে। চোখের দেখায়, কানের শোনায়, মনের ভাবায়, কল্পনার খেলায়, হৃদয়ের নানান্ টানে মানুষের মধ্যে সে স্বভাবতই নিজেকে পুরাপুরি আদায় করে। এইজন্য মানুষকে জানিয়া, মানুষকে টানিয়া, মানুষের কাজ করিয়া সে এমন কানায়-কানায় ভরিয়া উঠে। এইজন্যই দেশে এবং কালে যে মানুষ যত বেশি মানুষের মধ্যে আপনার আত্মাকে মিলাইয়া নিজেকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তিনি ততই মহৎ-মানুষ। তিনি যথার্থই মহাত্মা। সমস্ত মানুষেরই মধ্যে আমার আত্মার সার্থকতা, এ যে ব্যক্তি কোনো-না-কোনো সুযোগে কিছু-না-কিছু বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার ভাগ্যে মনুষ্যত্বের ভাগ কম পড়িয়া গেছে। সে আত্মাকে আপনার মধ্যে জানাতেই আত্মাকে ছোট করিয়া জানে।

সকলের মধ্যেই নিজেকে জানা—আমাদের মানবাত্মার এই যে একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, স্বার্থ তাহার একটা বাধা, অহঙ্কার তাহার একটা বাধা; সংসারে এই সকল নানা বাধায় আমাদের আত্মার সেই স্বাভাবিক গতিস্রোত খণ্ডখণ্ড হইয়া যায়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে আমরা অবাধে দেখিতে পাই না।

কিন্তু জানি, কেহ কেহ তর্ক করিবেন, মানবাত্মার যেটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সংসারে তাহার এত লাঞ্ছনা কেন? যেটাকে তুমি বাধা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছ—যাহা স্বার্থ, যাহা অহঙ্কার, তাহাকেই বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম না বলিবে কেন?

বস্তুত অনেকে তাহা বলিয়াও থাকে। কেন না, স্বভাবের চেয়ে স্বভাবের বাধাটাই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। দুই-চাকার গাড়িতে মানুষ যখন প্রথম চড়া অভ্যাস করে, তখন চলার চেয়ে পড়াটাই তাহার ভাগ্যে বেশি ঘটে। সেই সময়ে কেহ যদি বলে, লোকটা চড়া অভ্যাস

করিতেছে না, পড়াই অভ্যাস করিতেছে, তবে তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা। সংসারে স্বার্থ এবং অহঙ্কারের ধাক্কা ত পদে পদেই দেখিতে পাই, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়াও মানুষের নিগূঢ় স্বধর্ম্মরক্ষার চেষ্টা অর্থাৎ সকলের সঙ্গে মিলিবার চেষ্টা যদি না দেখিতে পাই, যদি পড়াটা-কেই স্বাভাবিক বলিয়া তক্‌রার করি, তবে সে নিতান্তই কলহ করা হয়।

বস্তুত যে ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, তাহাকে স্বাভাবিক বলিয়া জানিবার জন্যই, তাহাকে তাহার পুরা দমে কাজ যোগাইবার জন্যই তাহাকে বাধা দিতে হয়। সেই উপায়েই সে নিজেকে সচেতনভাবে জানে—এবং তাহার চৈতন্য যতই পূর্ণ হয়, তাহার আনন্দও ততই নিবিড় হইতে থাকে। সকল বিষয়েই এইরূপ।

এই যেমন বুদ্ধি। কার্য্যকারণের সম্বন্ধ ঠিক করা বুদ্ধির একটা ধর্ম্ম। সহজপ্রত্যক্ষ জিনিষের মধ্যে সে যতক্ষণ তাহা সহজেই করে, ততক্ষণ সে নিজেকে যেন পুরাপুরি দেখিতেই পায় না। কিন্তু বিশ্বজগতে কার্য্যকারণের সম্বন্ধগুলি এতই গোপনে তলাইয়া আছে যে, তাহা উদ্ধার করিতে বুদ্ধিকে নিয়তই প্রাণপণে খাটিতে হইতেছে। এই বাধা কাটাই-বার খাটুনিতেই বুদ্ধি বিজ্ঞানদর্শনের মধ্যে নিজেকে খুব নিবিড় করিয়া অনুভব করে—তাহাতেই তাহার গৌরব বাড়ে। বস্তুত ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বিজ্ঞানদর্শন আর কিছুই নহে, বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধির নিজেকেই উপলব্ধি। সে নিজের নিয়ম যেখানে দেখে, সেখানে সেই পদার্থকে এবং নিজেকে একত্র করিয়া দেখে। ইহাকেই বলে বুঝিতে পারা। এই দেখাতেই বুদ্ধির আনন্দ। নহিলে আপেলফল যে কারণে মাটিতে পড়ে, সূর্য্য সেই কারণেই পৃথিবীকে টানে, এ কথা বাহির করিয়া মানুষের এত খুসি হইবার কোনো কারণ ছিল না। টানে ত টানে, আমার তাহাতে কি? আমার তাহাতে এই, জগৎচরাচরের

এই ব্যাপক ব্যাপারকে আমার বুদ্ধির মধ্যে পাইলাম—সর্ব্বত্রই আমার বুদ্ধিকে অনুভব করিলাম। আমার বুদ্ধির সঙ্গে ধূলি হইতে সূর্য্যচন্দ্রতারা সবটা মিলিল। এম্‌নি করিয়া অন্তহীন জগৎরহস্য মানুষের বুদ্ধিকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া মানুষের কাছে তাহাকে বেশি করিয়া প্রকাশ করিতেছে—নিখিল চরাচরের সঙ্গে মিলাইয়া আবার তাহা মানুষকে ফিরাইয়া দিতেছে। সমস্তের সঙ্গে এই বুদ্ধির মিলনই জ্ঞান। এই মিলনেই আমাদের বোধশক্তির আনন্দ।

তেম্‌নি সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার মনুষ্যত্বের মিলনকে পাওয়াই মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং তাহাতেই তাহার যথার্থ আনন্দ। এই ধর্ম্মকে পূর্ণ-চেতনরূপে পাইবার জন্যই অন্তরে-বাহিরে কেবলি বিরোধ ও বাধার ভিতর দিয়াই তাহাকে চলিতে হয়। এইজন্যই স্বার্থ এত প্রবল, আত্মাভিমান এত অটল, সংসারের পথ এত দুর্গম। এই সমস্ত বাধার ভিতর দিয়া যেখানে মানবের ধর্ম্ম সমুজ্জ্বল হইয়া পূর্ণ-সুন্দররূপে সবলে নিজেকে প্রকাশ করে, সেখানে বড় আনন্দ। সেখানে আমরা আপনাকেই বড় করিয়া পাই।

মহাপুরুষের জীবনী এইজন্যই আমরা পড়িতে চাই। তাঁহাদের চরিত্রে আমাদের নিজের বাধাযুক্ত আচ্ছন্ন প্রকৃতিকেই মুক্ত ও প্রসারিত দেখিতে পাই। ইতিহাসে আমরা আমাদেরই স্বভাবকে নানা লোকের মধ্যে নানা দেশে নানা কালে নানা ঘটনায় নানা পরিমাণে ও নানা আকারে দেখিয়া রস পাইতে থাকি। তখন আমি স্পষ্ট করিয়া বুঝি বা না বুঝি, মনের মধ্যে স্বীকার করিতে থাকি সকল মানুষকে লইয়াই আমি এক—সেই ঐক্য যতটা-মাত্রায় আমি ঠিকমত অনুভব করিব, ততটা-মাত্রায় আমার মঙ্গল, আমার আনন্দ।

কিন্তু জীবনীতে ও ইতিহাসে আমরা সমস্তটা আগাগোড়া স্পষ্ট দেখিতে পাই না। তাহাও অনেক বাধায়, অনেক সংশয়ে ঢাকা পড়িয়া

আমাদের কাছে দেখা দেয়। তাহার মধ্য দিয়াও আমরা মানুষের যে পরিচয় পাই, তাহা খুব বড়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই পরিচয়কে আবার আমাদের মনের মত করিয়া, তাহাকে আমাদের সাধ মিটাইয়া সাজাইয়া চিরকালের মত ভাষায় ধরিয়া রাখিবার জন্য আমাদের অন্তরের একটা চেষ্টা আছে। তেম্নি করিতে পারিলে তবেই সে যেন বিশেষ করিয়া আমার হইল। তাহার মধ্যে সুন্দর ভাষায়, সুরচিত নৈপুণ্যে আমার প্রীতিকে প্রকাশ করিতেই সে মানুষের হৃদয়ের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সে আর এই সংসারের আনাগোনার স্রোতে ভাসিয়া গেল না।

এম্নি করিয়া, বাহিরের যে সকল অপরূপ প্রকাশ,—তাহা সূর্য্যোদয়ের ছটা হউক্ বা মহৎ চরিত্রের দীপ্তি হউক্ বা নিজের অন্তরের আবেগ হউক্,—যাহা-কিছু ক্ষণে-ক্ষণে আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, হৃদয় তাহাকে নিজের একটা সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত করিয়া আপনার বলিয়া তাহাকে আঁক্‌ড়িয়া রাখে। এম্নি করিয়া সেই সকল উপলক্ষ্যে সে আপনাকেই বিশেষ করিয়া প্রকাশ করে।

(সংসারে মানুষ যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রকাশের দুইটি মোটা ধারা আছে। একটা ধারা মানুষের কর্ম্ম, আর একটা ধারা মানুষের সাহিত্য।) এই দুই ধারা একেবারে পাশাপাশি চলিয়াছে। মানুষ আপনার কর্ম্মরচনায় এবং ভাবরচনায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। ইহারা উভয়ে উভয়কে পূরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। এই দুয়ের মধ্য দিয়াই ইতিহাসে ও সাহিত্যে মানুষকে পূরাপূরি জানিতে হইবে।

কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ তাহার দেহ-মন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ও অভিজ্ঞতা লইয়া গৃহ, সমাজ, রাজ্য ও ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছে। এই গড়ার মধ্যে, মানুষ যাহা জানিয়াছে, যাহা পাইয়াছে, যাহা চায়, সমস্তই প্রকাশ পাইতেছে। এম্নি করিয়া মানুষের প্রকৃতি জগতের সঙ্গে জড়াইয়া-

গিয়া নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া সকলের মাঝখানে আপনাকে দাঁড় করাইয়া তুলিতেছে। এম্‌নি করিয়া, যাহা ভাবের মধ্যে ঝাপ্‌সা হইয়াছিল, ভবের মধ্যে তাহা আকারে জন্ম লইতেছে; যাহা একের মধ্যে ক্ষীণ হইয়াছিল, তাহা অনেকের মধ্যে নানা-অঙ্গ-বিশিষ্ট বড় ঐক্য পাইতেছে। এইরূপে ক্রমে এমন হইয়া উঠিতেছে যে, প্রত্যেক স্বতন্ত্র মানুষ এই বহুদিনের ও বহুজনের গড়া ঘর, সমাজ, রাজ্য ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া ছাড়া নিজেকে স্পষ্ট করিয়া, পূরা করিয়া প্রকাশ করিতেই পারে না। এই সমস্তটাই মানুষের কাছে মানুষের প্রকাশরূপ হইযা উঠিয়াছে। এমন অবস্থা না হইলে তাহাকে আমরা সভ্যতা অর্থাৎ পূর্ণমনুষ্যত্ব বলিতেই পারি না। রাজ্যেই বল, সমাজেই বল, যে ব্যাপারে আমরা একএকজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একের সঙ্গে সকলের যোগ নাই, সেইখানেই আমরা অসভ্য। এইজন্য সভ্যসমাজে রাজ্যে আঘাত লাগিলে সেই রাজ্যের প্রত্যেক লোকের বৃহৎ কলেবরটাতে আঘাত লাগে; সমাজ কোনোদিকে সঙ্কীর্ণ হইলে সেই সমাজের প্রত্যেক লোকের আত্মবিকাশ আচ্ছন্ন হইতে থাকে। মানুষের সংসারক্ষেত্রের এই সমস্ত রচনা যে পরিমাণে উদার হয়, সেই পরিমাণে, সে আপনার মনুষ্যত্বকে অবাধে প্রকাশ করিতে পারে। যে পরিমাণে সেখানে সঙ্কোচ আছে, প্রকাশের অভাবে মানুষ সেই পরিমাণে সেখানে দীন হইয়া থাকে; কারণ, সংসার কাজের উপলক্ষ্য করিয়া মানুষকে প্রকাশেরই জন্য এবং প্রকাশই একমাত্র আনন্দ।

কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ এই যে আপনাকেই প্রকাশ করে, এখানে প্রকাশ করাটাই তাহার আসল লক্ষ্য নয়—ওটা কেবল গৌণফল। গৃহিণী ঘরের কাজের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু প্রকাশ করাটাই তাঁহার মনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য নয়। গৃহকর্ম্মের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার নানা অভিপ্রায় সাধন করেন; সেই সকল অভিপ্রায় কাজের

উপর হইতে ঠিক্‌রাইয়া-আসিয়া তাঁহার প্রকৃতিকে আমাদের কাছে বাহির করিয়া দেয়।

কিন্তু সময় আছে—যখন মানুষ মুখ্যতই আপনাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে। মনে কর যেদিন ঘরে বিবাহ, সেদিন একদিকে বিবাহের কাজটা সারিবার জন্য আয়োজন চলিতে থাকে, আবার অন্যদিকে শুধু কাজসারা নহে, হৃদয়কে জানাইয়া দিবারও প্রয়োজন ঘটে; সেদিন ঘরের লোক ঘরের মঙ্গলকে ও আনন্দকে সকলের কাছে ঘোষণা না করিয়া দিয়া থাকিতে পারে না। ঘোষণার উপায় কি? বাঁশী বাজে, দীপ জলে, ফুলপাতার মালা দিয়া ঘর সাজানো হয়। সুন্দর ধ্বনি, সুন্দর গন্ধ, সুন্দর দৃশ্যের দ্বারা, উজ্জ্বলতার দ্বারা হৃদয় আপনাকে শতধারার ফোয়ারার মত চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিতে থাকে। এম্‌নি করিয়া নানাপ্রকার ইঙ্গিতে আপনার আনন্দকে সে অন্যের মধ্যে জাগাইয়া-তুলিয়া সেই আনন্দকে সকলের মধ্যে সত্য করিতে চায়।

মা তাঁহার কোলের শিশুর সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু শুধু তাই নয়—কেবল কাজ করিয়া নয়, মায়ের স্নেহ আপনা-আপনি বিনা কারণে আপনাকে বাহিরে ব্যক্ত করিতে চায়। তখন সে কত খেলায়, কত আদরে, কত ভাষায়, ভিতর হইতে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। তখন সে শিশুকে নানা রঙের সাজে সাজাইয়া, নানা গহনা পরাইয়া নিতান্তই বিনা প্রয়োজনে নিজের প্রাচুর্য্যকে প্রাচুর্য্যদ্বারা, মাধুর্য্যকে সৌন্দর্য্যদ্বারা বাহিরে বিস্তার না করিয়া থাকিতে পারে না।

ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের হৃদয়ের ধর্ম্মই এই। সে আপনার আবেগকে বাহিরের জগতের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে চায়। সে নিজের মধ্যে নিজে পূরা নহে। অন্তরের সত্যকে কোনোপ্রকারে বাহিরে সত্য করিয়া তুলিলে তবে সে বাঁচে। যে বাড়ীতে সে থাকে, সে বাড়ীটি তাহার কাছে কেবল ইঁটকাঠের ব্যাপার হইয়া থাকে না—

সে বাড়ীটিকে সে বাস্ত করিয়া তুলিয়া তাহাতে হৃদয়ের রং মাথাইয়া দেয়। যে দেশে হৃদয় বাস করে, সে দেশ তাহার কাছে মাটি-জল-আকাশ হইয়া থাকে না—সেই দেশ তাহার কাছে ঈশ্বরের জীবধাত্রী-রূপকে জননীভাবে প্রকাশ করিলে তবে সে আনন্দ পায়, নহিলে হৃদয় আপনাকে বাহিরে দেখিতে পায় না। এমন না ঘটিলে হৃদয় উদাসীন হয় এবং ঔদাসীন্য হৃদয়ের পক্ষে মৃত্যু।

সত্যের সঙ্গে হৃদয় এম্‌নি করিয়া কেবলি রসের সম্পর্ক পাতায় রসের সম্বন্ধ যেখানে আছে, সেখানে আদানপ্রদান আছে। আমাদের হৃদয়লক্ষ্মী জগতের যে কুটুম্ববাড়ী হইতে যেমন সওগাদ পায়, সেখানে তাহার অনুরূপ সওগাদটি না পাঠাইতে পারিলে তাহার গৃহিণীপনায় যেন ঘা লাগে। এইরূপ সওগাদের ডালায় নিজের কুটুম্বিতাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে নানা মালমস্‌লা লইয়া, ভাষা লইয়া, স্বর লইয়া, তুলি লইয়া, পাথর লইয়া সৃষ্টি করিতে হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার নিজের কোনো প্রয়োজন সারা হইল ত ভালই, কিন্তু অনেক সময়ে সে আপনার প্রয়োজন নষ্ট করিয়াও কেবল নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র। সে দেউলে হইয়াও আপনাকে ঘোষণা করিতে চায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এই যে প্রকাশের বিভাগ, ইহাই তাহার প্রধান বাজে-খরচের বিভাগ—এইখানেই বুদ্ধি-খাতাঞ্চিকে বারংবার কপালে করাঘাত করিতে হয়।

হৃদয় বলে, আমি অন্তরে যতখানি, বাহিরেও ততখানি সত্য হইব কি করিয়া? তেমন সামগ্রী, তেমন সুযোগ বাহিরে কোথায় আছে? সে কেবলি কাঁদিতে থাকে যে, আমি আপনাকে দেখাইতে অর্থাৎ আপনাকে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ধনী হৃদয়ের মধ্যে যখন আপনার ধনিত্ব অনুভব করে, তখন সেই ধনিত্ব বাহিরে প্রকাশ করিতে গিয়া কুবেরের ধনকেও সে ফুঁকিয়া দিতে পারে।

প্রেমিক হৃদয়ের মধ্যে যখন যথার্থ প্রেম অনুভব করে, তখন সেই প্রেমকে প্রকাশ অর্থাৎ বাহিরে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য সে ধনপ্রাণ-মান সমস্তই এক নিমেষে বিসর্জ্জন করিতে পারে। এম্‌নি করিয়া বাহিরকে অন্তরের ও অন্তরকে বাহিরের সামগ্রী করিবার একান্ত ব্যাকুলতা হৃদয়ের কিছুতেই ঘুচে না। বলরামদাসের একটি পদে আছে—

"তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।"

অর্থাৎ প্রিয়বস্তু যেন হৃদয়ের ভিতরকারই বস্তু—তাহাকে কে যেন বাহিরে আনিয়াছে—সেইজন্য তাহাকে আবার ভিতরে ফিরাইয়া লইবার জন্য এতই আকাঙ্ক্ষা।—আবার ইহার উল্টাও আছে। হৃদয় আপনার ভিতরের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগকে যখন বাহিরের কিছুতে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তখন অন্তত সে নানা উপকরণ লইয়া নিজের হাতে তাহার একটা প্রতিরূপ গড়িবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এম্‌নি করিয়া জগৎকে আপনার ও আপনাকে জগতের করিয়া তুলিবার জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা কেবলি কাজ করিতেছে। নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করা এই কাজেরই একটি অঙ্গ। সেই জন্য এই প্রকাশ-ব্যাপারে হৃদয় মানুষকে সর্ব্বস্ব খোয়াইতেও রাজি করিয়া আনে।

বর্ব্বর সৈন্য যখন লড়াই করিতে যায়, তখন সে কেবলমাত্র শত্রুপক্ষকে হারাইয়া দিবার জন্যই ব্যস্ত থাকে না। তখন সে সর্ব্বাঙ্গে রং চং মাখিয়া, চীৎকার করিয়া, বাজনা বাজাইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিয়া চলে—ইহা অন্তরের হিংসাকে বাহিরে মূর্ত্তিমান্‌ করিয়া তোলা। এ না হইলে হিংসা যেন পূরা হয় না। হিংসা, অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে, আর আত্মপ্রকাশের তৃপ্তির জন্য এই সমস্ত বাজে-কাণ্ড করিতে থাকে।

এখনকার পাশ্চাত্যযুদ্ধেও জিগীষার আত্ম-প্রকাশের জন্য বাজনাবাদ্য,

সাজসরঞ্জাম যে একেবারেই নাই, তাহা নয়। তবু এই সকল আধুনিক যুদ্ধে বুদ্ধির চালেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছে, ক্রমেই মানবহৃদয়ের ধর্ম্ম ইহা হইতে সরিয়া আসিতেছে। ইজিপ্টে দরবেশের দল যখন ইংরেজসৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তাহারা কেবল লড়াইয়ে জিতিবার জন্যই মরে নাই। তাহারা অন্তরের উদ্দীপ্ত তেজকে প্রকাশ করিবার জন্যই শেষ ব্যক্তিটি পর্য্যন্ত মরিয়াছিল। লড়াইয়ে যাহারা কেবল জিতিতেই চায়, তাহারা এমন অনাবশ্যক কাণ্ড করে না। আত্মহত্যা করিয়াও মানুষের হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়! এত-বড় বাজে-খরচের কথা কে মনে করিতে পারে?

আমরা যে পূজা করিয়া থাকি, তাহা বুদ্ধিমানেরা এক ভাবে করে, ভক্তিমানেরা আর-এক ভাবে করে। বুদ্ধিমান্ মনে করে, পূজা করিয়া ভগবানের কাছ হইতে সদ্গতি আদায় করিয়া লইব, আর ভক্তিমান্ বলে, পূজা না করিলে আমার ভক্তির পূর্ণতা হয় না—ইহার আর কোনো ফল নাই থাকুক্, হৃদয়ের ভক্তিকে বাহিরে স্থান দিয়া তাহাকেই পূরা আশ্রয় দেওয়া হইল। এইরূপে ভক্তি পূজার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিয়া নিজেকেই সার্থক করে। বুদ্ধিমানের পূজা সুদে টাকা খাটানো—ভক্তিমানের পূজা একেবারেই বাজে-খরচ। হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া লোকসানকে একেবারে গণ্যই করে না।

বিশ্বজগতের মধ্যেও যেখানে আমরা আমাদের হৃদয়ের এই ধর্ম্মটি দেখি, সেখানেই আমাদের হৃদয় আপনিই আপনাকে ধরা দিয়া বসে, কোনো কথাটি জিজ্ঞাসা করে না। জগতের মধ্যে এই বেহিসাবী বাজে-খরচের দিক্টা সৌন্দর্য্য। যখন দেখি, ফুল কেবলমাত্র বীজ হইয়া উঠিবার জন্যই তাড়া লাগাইতেছে না, নিজের সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া সুন্দর হইয়া ফুটিতেছে; মেঘ কেবল জল ঝরাইয়া কাজ

সারিয়া তাড়াতাড়ি ছুটি লইতেছে না, রহিয়া-বসিয়া বিনা প্রয়োজনে রঙের ছটায় আমাদের চোখ কাড়িয়া লইতেছে; গাছগুলা কেবল কাঠি হইয়া শীর্ণ কাঙালের মত বৃষ্টি ও আলোকের জন্য হাত বাড়াইয়া নাই, সবুজ শোভার পুঞ্জ পুঞ্জ ঐশ্বর্য্যে দিগ্বধূদের ডালি ভরিয়া দিতেছে; যখন দেখি, সমুদ্র যে কেবল জলকে মেঘরূপে পৃথিবীর চারিদিকে প্রচার করিয়া দিবার একটা মস্ত আপিস্, তাহা নহে, সে আপনার তরল নীলিমার অতলস্পর্শ ভয়ের দ্বারা ভীষণ; এবং পর্ব্বত কেবল ধরাতলে নদীর জল জোগাইয়াই ক্ষান্ত নহে, সে যোগনিমগ্ন রুদ্রের মত ভয়ঙ্করকে আকাশ জুড়িয়া নিস্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে; তখন জগতের মধ্যে আমরা হৃদয়ধর্ম্মের পরিচয় পাই। তখন চিরপ্রবীণ বুদ্ধি মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করে, জগৎ জুড়িয়া এত অনাবশ্যক চেষ্টার বাজে-খরচ কেন? চির-নবীন হৃদয় বলে, কেবলমাত্র আমাকে ভুলাইবার জন্যই—আর ত কোনো কারণ দেখি না। হৃদয়ই জানে, জগতের মধ্যে একটি হৃদয় কেবলই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। নহিলে সৃষ্টির মধ্যে এত রূপ, এত গান, এত হাবভাব, এত আভাস-ইঙ্গিত, এত সাজসজ্জা কেন? হৃদয় যে ব্যবসাদারীর কৃপণতায় ভোলে না, সেইজন্যই তাহাকে ভুলাইতে জলে-স্থলে-আকাশে পদে-পদে প্রয়োজনকে গোপন করিয়া এত অনাবশ্যক আয়োজন। জগৎ যদি রসময় না হইত, তবে আমরা নিতান্তই ছোট হইয়া অপমানিত হইয়া থাকিতাম; আমাদের হৃদয় কেবলি বলিত, জগতের যজ্ঞে আমারই নিমন্ত্রণ নাই। কিন্তু সমস্ত জগৎ তাহার অসংখ্য কাজের মধ্যেও রসে ভরিয়া-উঠিয়া হৃদয়কে এই মধুর কথাটি বলিতেছে যে, আমি তোমাকে চাই। নানারকম করিয়া চাই; হাসিতে চাই, কান্নাতে চাই; ভয়ে চাই, ভরসায় চাই; ক্ষোভে চাই, শান্তিতে চাই।

এম্‌নি জগতের মধ্যেও আমরা দুটা ব্যাপার দেখিতেছি—একটা কাজের প্রকাশ, একটা ভাবের প্রকাশ। কিন্তু কাজের ভিতর দিয়া

যাহা প্রকাশ হইতেছে, তাহাকে সমগ্ররূপে দেখা ও বোঝা আমাদের কর্ম্ম নয়। ইহার মধ্যে যে অমেয় জ্ঞানশক্তি আছে, আমাদের জ্ঞান দিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

কিন্তু ভাবের প্রকাশ একেবারে প্রত্যক্ষ-প্রকাশ। সুন্দর যাহা, তাহা সুন্দর। বিরাট যাহা, তাহা মহান্। রুদ্র যাহা, তাহা ভয়ঙ্কর। জগতের যাহা রস, তাহা একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং আমাদের হৃদয়ের রসকে বাহিরে টানিয়া আনিতেছে। এই মিলনের মধ্যে লুকোচুরি যতই থাক্, বাধা-বিঘ্ন যতই ঘটুক্, তবু প্রকাশ ছাড়া এবং মিলন ছাড়া ইহার মধ্যে আর কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তবেই দেখিতেছি, জগৎসংসারে ও মানব-সংসারে একটা সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বরের সত্যরূপ-জ্ঞানরূপ জগতের নানা কাজে প্রকাশ পাইতেছে, আর তাঁহার আনন্দরূপ জগতের নানা রসে প্রত্যক্ষ হইতেছে। কাজের মধ্যে তাঁহার জ্ঞানকে আয়ত্ত করা শক্ত—রসের মধ্যে তাঁহার আনন্দকে অনুভব করায় জটিলতা নাই। কারণ, রসের মধ্যে তিনি যে নিজেকে প্রকাশই করিতেছেন।

মানুষের সংসারেও আমাদের জ্ঞানশক্তি কাজ করিতেছে, আমাদের আনন্দশক্তি রসের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। কাজের মধ্যে আমাদের আত্মরক্ষার শক্তি, আর রসের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রকাশের শক্তি। আত্মরক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, আর আত্মপ্রকাশ আমাদের প্রয়োজনের বেশি।

প্রয়োজনে প্রকাশকে এবং প্রকাশে প্রয়োজনকে বাধা দেয়, যুদ্ধের উদাহরণে তাহা দেখাইয়াছি। স্বার্থ বাজে-খরচ করিতে চায় না, অথচ বাজে-খরচেই আনন্দ আত্মপরিচয় দেয়। এইজন্যই স্বার্থের ক্ষেত্রে, আপিসে, আমাদের আত্মপ্রকাশ যতই অল্প হয়, ততই তাহা

শ্রদ্ধেয় হইয়া থাকে, এবং এইজন্যই আনন্দের উৎসবে স্বার্থকে যতই বিস্মৃত হইতে দেখি, উৎসব ততই উজ্জ্বল হইতে থাকে।

তাই সাহিত্যে মানুষের আত্মপ্রকাশে কোনো বাধা নাই। স্বার্থ সেখান হইতে দূরে। দুঃখ সেখানে আমাদের হৃদয়ের উপর চোখের জলের বাষ্প সৃজন করে, কিন্তু আমাদের সংসারের উপর হস্তক্ষেপ করে না; ভয় আমাদের হৃদয়কে দোলা দিতে থাকে, কিন্তু আমাদের শরীরকে আঘাত করে না; সুখ আমাদের হৃদয়ে পুলকস্পর্শ সঞ্চার করে, কিন্তু আমাদের লোভকে নাড়া দিয়া অত্যন্ত জাগাইয়া তোলে না। এইরূপে মানুষ আপনার প্রয়োজনের সংসারের ঠিক পাশে-পাশেই একটা প্রয়োজন-ছাড়া সাহিত্যের সংসার রচনা করিয়া চলিয়াছে। সেখানে সে নিজের বাস্তব কোনো ক্ষতি না করিয়া নানা রসের দ্বারা আপনার প্রকৃতিকে নানারূপে অনুভব করিবার আনন্দ পায়,—আপনার প্রকাশকে বাধাহীন করিয়া দেখে। সেখানে দায় নাই, সেখানে খুসি। সেখানে পেয়াদা-বরকন্দাজ নাই, সেখানে স্বয়ং মহারাজা।

এইজন্য সাহিত্যে আমরা কিসের পরিচয় পাই? না, মানুষের যাহা প্রাচুর্য্য, যাহা ঐশ্বর্য্য, যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যাহা তাহার সংসারের মধ্যেই ফুরাইয়া যাইতে পারে নাই।

এইজন্যই, ইতিমধ্যে আমার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছি, ভোজনরস যদি-চ পৃথিবীতে ছোট ছেলে হইতে বুড়া পর্য্যন্ত সকলেরই কাছে সুপরিচিত, তবু সাহিত্যে তাহা প্রহসন ছাড়া অন্যত্র তেমন করিয়া স্থান পায় নাই। কারণ, সে রস আহারের তৃপ্তিকে ছাপাইয়া উছলিয়া উঠে না। পেটটি পূরাইয়া একটি জলদগম্ভীর "আঃ—" বলিয়াই তাহাকে হাতে-হাতেই নগদ-বিদায় করিয়া দিই। সাহিত্যের রাজদ্বারে তাহাকে দক্ষিণার জন্য নিমন্ত্রণপত্র দিই না। কিন্তু যাহা আমাদের ভাঁড়ারঘরের ভাঁড়ের মধ্যে কিছুতেই কুলায় না, সেই সকল রসের বন্যাই সাহিত্যের

মধ্যে ঢেউ তুলিয়া কলধ্বনি করিতে করিতে বহিয়া যায়। মানুষ তাহাকে কাজের মধ্যেই নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে না বলিয়াই ভরা-হৃদয়ের বেগে সাহিত্যের মধ্যে তাহাকে প্রকাশ করিয়া তবে বাঁচে।

এইরূপ প্রাচুর্য্যেই মানুষের যথার্থ প্রকাশ। মানুষ যে ভোজনপ্রিয়, তাহা সত্য বটে, কিন্তু মানুষ যে বীর, ইহাই সত্যতম। মানুষের এই সত্যের জোর সাম্‌লাইবে কে? তাহা ভাগীরথীর মত পাথর গুঁড়াইয়া, ঐরাবতকে ভাসাইয়া, গ্রাম-নগর-শস্যক্ষেত্রের তৃষ্ণা মিটাইয়া একেবারে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। মানুষের বীরত্ব মানুষের সংসারের সমস্ত কাজ সারিয়া-দিয়া সংসারকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

এম্‌নি করিয়া স্বভাবতই মানুষের যাহা কিছু বড়, যাহা-কিছু নিত্য, যাহা সে কাজে-কর্ম্মে ফুরাইয়া ফেলিতে পারে না, তাহাই মানুষের সাহিত্যে ধরা পড়িয়া আপনা-আপনি মানুষের বিরাটরূপকেই গড়িয়া তুলে।

আরো একটি কারণ আছে। সংসারে যাহাকে আমরা দেখি, তাহাকে ছড়াইয়া দেখি—তাহাকে এখন একটু তখন একটু, এখানে একটু সেখানে একটু দেখি—তাহাকে আরো দশটার সঙ্গে মিশাইয়া দেখি। কিন্তু সাহিত্যে সেই সকল ফাঁক, সেই সকল মিশাল থাকে না। সেখানে যাহাকে প্রকাশ করা হয়, তাহার উপরেই সমস্ত আলো ফেলা হয়। তখনকার মত আর-কিছুকেই দেখিতে দেওয়া হয় না। তাহার জন্য নানা কৌশলে এমন একটি স্থান তৈরি করিয়া দেওয়া হয়, যেখানে সে-ই কেবল দীপ্যমান।

এমন অবস্থায় এমন জমাট স্বাতন্ত্র্যে, এমন প্রখর আলোকে যাহাকে মানাইবে না, তাহাকে আমরা স্বভাবতই এ জায়গায় দাঁড় করাই না। কারণ, এমন স্থানে অযোগ্যকে দাঁড় করাইলে তাহাকে লজ্জিত করা হয়। সংসারের নানা আচ্ছাদনের মধ্যে পেটুক তেমন

করিয়া চোখে পড়ে না—কিন্তু সাহিত্যমঞ্চের উপর তাহাকে একাগ্র আলোকে ধরিয়া দেখাইলে সে হাস্যকর হইয়া উঠে। এইজন্য মানুষের যে প্রকাশটি তুচ্ছ নয়—মানব-হৃদয় যাহাকে করুণায় বা বীর্য্যে, রুদ্রতায় বা শান্তিতে আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত না হয়, (যাহা কলানৈপুণ্যের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়াইয়া নিত্যকালের অনিমেষ দৃষ্টিপাত মাথা তুলিয়া সহ্য করিতে পারে, স্বভাবতই মানুষ তাহাকেই সাহিত্যে স্থান দেয়; নহিলে তাহার অসঙ্গতি আমাদের কাছে পীড়াজনক হইয়া উঠে। রাজা ছাড়া আর কাহাকেও সিংহাসনের উপব দেখিলে আমাদের মনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।)

কিন্তু সকল মানুষের বিচারবুদ্ধি বড় নয়, সকল সমাজও বড় নয়, এবং একএকটা সময় আসে, যখন ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র মোহে মানুষকে ছোট করিয়া দেয়। তখন সেই দুঃসময়ের বিকৃত দর্পণে ছোট জিনিষ বড় হইয়া দেখা দেয় এবং তখনকার সাহিত্যে মানুষ আপনার ছোটকেই বড় করিয়া তোলে—আপনার কলঙ্কের উপরেই স্পর্দ্ধার সঙ্গে আলো ফেলে। তখন কলার বদলে কৌশল, গৌরবের জায়গায় গর্ব্ব এবং টেনিসনের আসনে কিপ্লিঙের আবির্ভাব হয়।

কিন্তু মহাকাল বসিয়া আছেন। তিনি ত সমস্তই ছাঁকিয়া লইবেন। তাঁহার চালুনির মধ্য দিয়া যাহা ছোট, যাহা জীর্ণ, তাহা গলিয়া ধূলায় পড়িয়া ধূলা হইয়া যায়। নানা কাল ও নানা লোকের হাতে সেই সকল জিনিষই টেঁকে,—যাহার মধ্যে সকল মানুষই আপনাকে দেখিতে পায়। এম্‌নি করিয়া বাছাই হইয়া যাহা থাকিয়া যায়, তাহা মানুষের সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ধন।

এম্‌নি করিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির, মানুষের প্রকাশের একটি নিত্যকালীন আদর্শ আপনি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। সেই আদর্শই নূতন যুগের সাহিত্যেরও হাল ধরিয়া থাকে।

সেই আদর্শমতই যদি আমরা সাহিত্যের বিচার করি, তবে সমগ্র মানবের বিচারবুদ্ধির সাহায্য লওয়া হয়।

এইবার আমার আসল কথাটি বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; সেটি এই—সাহিত্যকে দেশকালপাত্রে ছোট করিয়া দেখিলে ঠিকমত দেখাই হয় না। আমরা যদি এইটে বুঝি যে, সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দেখিবার, তাহা দেখিতে পাইব। (যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষ্যমাত্র না হইয়াছে, সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া গেছে। যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে।) তবেই সাহিত্যকে এইভাবে দেখিতে হইবে যে, বিশ্বমানব রাজমিস্ত্রী হইয়া এই মন্দিরটি গড়িয়া তুলিতেছেন; লেখকেরা নানা দেশ ও নানা কাল হইতে আসিয়া তাহার মজুরের কাজ করিতেছে। সমস্ত ইমারতের প্ল্যান্‌টা কি, তাহা আমাদের কারো সাম্‌নে নাই বটে, কিন্তু যেটুকু ভুল হয়, সেটুকু বার-বার ভাঙা পড়ে;—প্রত্যেক মজুরকে তাহার নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা খাটাইয়া নিজের রচনাটুকুকে সমগ্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া সেই অদৃশ্য প্ল্যানের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে হয়; ইহাতেই তাহার ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং এইজন্যই তাহাকে সাধারণ মজুরের মত কেহ সামান্য বেতন দেয় না, তাহাকে ওস্তাদের মত সম্মান করিয়া থাকে।

আমার উপরে যে আলোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে, ইংরেজিতে আপনারা তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।

কর্ম্মের মধ্যে মানুষ কোন্ কথা বলিতেছে, তাহার লক্ষ্য কি, তাহার চেষ্টা কি ইহা যদি বুঝিতে হয়, তবে সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে

মানুষের অভিপ্রায়ের অনুসরণ করিতে হয়—আকবরের রাজত্ব বা গুজরাটের ইতিবৃত্ত বা এলিজাবেথের চরিত্র, এমন করিয়া আলাদা-আলাদা দেখিলে কেবল খবর-জানার কৌতুহলনিবৃত্তি হয় মাত্র। যে জানে, আকবর বা এলিজাবেথ উপলক্ষ্যমাত্র; যে জানে, মানুষ সমস্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়া নিজের গভীরতম অভিপ্রায়কে নানা সাধনায়, নানা ভুল ও নানা সংশোধনে সিদ্ধ করিবার জন্য কেবলি চেষ্টা করিতেছে; যে জানে, মানুষ সকল দিকেই সকলের সহিত বৃহৎভাবে যুক্ত হইয়া নিজেকে মুক্তি দিবার প্রয়াস পাইতেছে; যে জানে, স্বতন্ত্র, নিজেকে রাজতন্ত্রে ও রাজতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে সার্থক করিবার জন্য যুঝিয়া মরিতেছে;—মানব বিশ্বমানবের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য, ব্যষ্টি, সমষ্টির মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য নিজেকে লইয়া কেবলি ভাঙাগড়া করিতেছে; সে ব্যক্তি মানুষের ইতিহাস হইতে, লোকবিশেষকে নহে, সেই নিত্যমানুষের নিত্যসচেষ্ট অভিপ্রায়কে দেখিবারই চেষ্টা করে। সে কেবল তীর্থের যাত্রীদের দেখিয়াই ফিরিয়া আসে না—সমস্ত যাত্রীরা যে একমাত্র দেবতাকে দেখিবার জন্য নানাদিক্‌ হইতে আসিতেছে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তবে সে ঘরে ফেরে।

তেম্‌নি সাহিত্যের মধ্যে মানুষ আপনার আনন্দকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিতেছে, এই প্রকাশের বিচিত্রমূর্ত্তির মধ্যে মানুষের আত্মা আপনার কোন্‌ নিত্যরূপ দেখাইতে চায়, তাহাই বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে যথার্থ দেখিবার জিনিষ। সে আপনাকে রোগী, না ভোগী, না যোগী, কোন্‌ পরিচয়ে পরিচিত করিতে আনন্দবোধ করিতেছে, জগতের মধ্যে মানুষের আত্মীয়তা কতদূর পর্য্যন্ত সত্য হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সত্য কতদূর পর্য্যন্ত তাহার আপনার হইয়া উঠিল, ইহাই জানিবার জন্য এই সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাকে কৃত্রিম রচনা বলিয়া জানিলে হইবে না, ইহা একটি জগৎ; ইহার তত্ত্ব আমাদের

কোনো ব্যক্তিবিশেষের আয়ত্তাধীন নহে; বস্তুজগতের মত ইহার সৃষ্টি চলিয়াছেই; অথচ সেই অসমাপ্ত সৃষ্টির অন্তরতম স্থানে একটি সমাপ্তির আদর্শ অচল হইয়া আছে।

সূর্য্যের ভিতরের দিকে বস্তুপিণ্ড আপনাকে তরল-কঠিন নানা ভাবে গড়িতেছে, সে আমরা দেখিতে পাই না—কিন্তু তাহাকে ঘিরিয়া আলোকের মণ্ডল সেই সূর্য্যকে কেবলি বিশ্বের কাছে ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। এইখানেই সে আপনাকে কেবলি দান করিতেছে, সকলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিতেছে। মানুষকে যদি আমবা সমগ্রভাবে এম্‌নি করিয়া দৃষ্টির বিষয় করিতে পারিতাম, তবে তাহাকে এইরূপ সূর্য্যের মতই দেখিতাম। দেখিতাম, তাহার বস্তুপিণ্ড ভিতরে-ভিতরে ধীরে-ধীরে নানা স্তরে বিন্যস্ত হইয়া উঠিতেছে; আর তাহাকে ঘিরিয়া একটি প্রকাশের জ্যোতির্ম্মণ্ডলী নিয়তই আপনাকে চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়াই আনন্দ পাইতেছে। সাহিত্যকে মানুষের চারিদিকে সেই ভাষারচিত প্রকাশমণ্ডলীরূপে একবার দেখ। এখানে জ্যোতির ঝড় বহিতেছে, জ্যোতির উৎস উঠিতেছে, জ্যোতির্বাষ্পের সংঘাত ঘটিতেছে।

লোকালয়ের পথ দিয়া চলিতে চলিতে যখন দেখিতে পাও, মানুষের অবকাশ নাই; মুদী দোকান চালাইতেছে; কামার লোহা পিটিতেছে; মজুর বোঝা লইয়া চলিয়াছে; বিষয়ী আপনার খাতার হিসাব মিলাইতেছে; সেই সঙ্গে আর-একটা জিনিষ চোখে দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু একবার মনে মনে দেখ;—এই রাস্তার দুই ধারে ঘরে-ঘরে দোকানে-বাজারে অলিতে-গলিতে কত শাখায়-প্রশাখায় রসের ধারা কত পথ দিয়া কত মলিনতা, কত সঙ্কীর্ণতা, কত দারিদ্র্যের উপবে কেবলি আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে; রামায়ণ-মহাভারত, কথা-কাহিনী, কীর্ত্তন-পাঁচালি বিশ্বমানবের হৃদয়সুধাকে প্রত্যেক মানবের কাছে দিনরাত বাঁটিয়া দিতেছে; নিতান্ত তুচ্ছলোকের ক্ষুদ্র কাজের

পিছনে রামলক্ষ্মণ আসিয়া দাঁড়াইতেছেন; অন্ধকার বাসার মধ্যে পঞ্চবটীর করুণামিশ্রিত হাওয়া বহিতেছে; মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি, হৃদয়ের প্রকাশ মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রের কাঠিন্য ও দারিদ্র্যকে তাহার সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের কঙ্কণ পরা দুটি হাত দিয়া বেড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত সাহিত্যকে সমস্ত মানুষের চারিদিকে একবার এম্নি করিয়া দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, মানুষ আপনার বাস্তবসত্তাকে ভাবের সত্তায় নিজের চতুর্দ্দিকে আরো অনেকদূর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া লইয়া গেছে। তাহার বর্ষার চারিদিকে কত গানের বর্ষা, কাব্যের বর্ষা, কত মেঘদূত, কত বিদ্যাপতি বিস্তীর্ণ হইয়া আছে; তাহার ছোট ঘরটির সুখদুঃখকে সে কত চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজাদের সুখদুঃখের কাহিনীর মধ্যে বড় করিয়া তুলিয়াছে; তাহার ঘরের মেয়েটিকে ঘিরিয়া গিরিরাজকন্যার করুণা সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতেছে; কৈলাসের দরিদ্রদেবতার মহিমার মধ্যে সে আপনার দারিদ্র্যদুঃখকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে; এইরূপে অনবরত মানুষ আপনার চারিদিকে যে বিকিরণ সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে বাহিরে যেন নিজেকে নিজে ছাড়াইয়া নিজেকে নিজে বাড়াইয়া চলিতেছে। যে মানুষ অবস্থার দ্বারা সঙ্কীর্ণ, সেই মানুষ নিজের ভাবসৃষ্টিদ্বারা নিজের এই যে বিস্তার রচনা করিতেছে, সংসারের চারিদিকে যাহা একটি দ্বিতীয় সংসার, তাহাই সাহিত্য।

এই বিশ্বসাহিত্যে আমি আপনাদের পথপ্রদর্শক হইব, এমন কথা মনেও করিবেন না। নিজের নিজের সাধ্য অনুসারে এ পথ আমাদের সকলকে কাটিয়া চলিতে হইবে। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, পৃথিবী যেমন আমার ক্ষেত এবং তোমার ক্ষেত এবং তাঁহার ক্ষেত নহে; পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে জানা— তেম্নি সাহিত্য আমার রচনা, তোমার রচনা এবং তাঁহার রচনা নহে; আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এম্নি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি।

সেই গ্রাম্য সঙ্কীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব—প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব, এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশচেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সঙ্কল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।*

সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য।

"সৌন্দর্য্যবোধ" ও "বিশ্বসাহিত্য" প্রবন্ধে আমার বক্তব্যবিষয়টি স্পষ্ট হয় নাই, এমন অপবাদ প্রচার হওয়াতে যথাসাধ্য পুনরুক্তি বাঁচাইয়া মূলকথাটা পরিষ্কার করিয়া লইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যেমন জগতে যে ঘটনাটিকে কেবল এইমাত্র জানি যে, তাহা ঘটিতেছে, কিন্তু কেন ঘটিতেছে, তাহার পূর্ব্বাপর কি, জগতের অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কোথায়, তাহা না জানিলে তাহাকে পূরাপুরি আমাদের জ্ঞানে জানা হয় না—তেম্‌নি জগতে যে সত্য কেবল আছে মাত্র বলিয়াই জানি, কিন্তু তাহাতে আমার কোনো আনন্দই নাই, তাহা আমার হৃদয়ের পক্ষে একেবারে নাই বলিলেই হয়। এই যে এত-বড় জগতে আমরা রহিয়াছি, ইহার অনেকটাকেই আমাদের জানা-জগতের সম্পূর্ণ সামিল করিয়া আনিতে পারি নাই, এবং ইহার অধিকাংশই আমাদের মনোহর জগতের মধ্যে ভুক্ত হইয়া আমাদের আপন হইয়া উঠে নাই।

অথচ, জগতের যতটা জ্ঞানের দ্বারা আমি জানিব ও হৃদয়ের দ্বারা আমি পাইব, ততটা আমারই ব্যাপ্তি, আমারই বিস্তৃতি। জগৎ যে

* জাতীয় শিক্ষাপরিষদে পঠিত।

পরিমাণে আমার অতীত, সেই পরিমাণে আমিই ছোট। সেইজন্য আমার মনোবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, আমার কর্ম্মশক্তি নিখিলকে কেবলি অধিক করিয়া অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এম্‌নি করিয়াই আমাদের সত্তা সত্যে ও শক্তিতে বিস্তৃত হইয়া উঠে।

এই বিকাশের ব্যাপারে আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধ কোন্ কাজে লাগে? সে কি সত্যের যে বিশেষ অংশকে আমরা বিশেষ করিয়া সুন্দর বলি—কেবল তাহাকেই আমাদের হৃদয়ের কাছে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া বাকি অংশকে ম্লান ও তিরস্কৃত করিয়া দেয়? তা যদি হয়, তবে ত সৌন্দর্য্য আমাদের বিকাশের বাধা—নিখিল সত্যের মধ্যে হৃদয়কে ব্যাপ্ত হইতে দিবার পক্ষে সে আমাদের অন্তরায়। সে ত তবে সত্যের মাঝখানে বিন্ধ্যাচলের মত উঠিয়া তাহাকে সুন্দর-অসুন্দরের আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পরস্পরের মধ্যে চলাচলের পথকে দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। আমি বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, তাহা নহে;—জ্ঞান যেমন ক্রমে ক্রমে সমস্ত সত্যকেই আমাদের বুদ্ধিশক্তির আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে, সৌন্দর্য্যবোধও তেম্‌নি সমস্ত সত্যকেই ক্রমে ক্রমে আমাদের আনন্দের অধিকারে আনিবে, এই তাহার একমাত্র সার্থকতা। সমস্তই সত্য, এইজন্য সমস্তই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। এবং সমস্তই সুন্দর, এইজন্য সমস্তই আমাদের আনন্দের সামগ্রী।

গোলাপফুল আমার কাছে যে কারণে সুন্দর, সমগ্র জগতের মধ্যে সেই কারণটি বড় করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে সেইরূপ উদার প্রাচুর্য্য অথচ তেম্‌নি কঠিন সংযম;—তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপরিসীম বৈচিত্র্যে আপনাকে চতুর্দ্দিকে সহস্রধা করিতেছে এবং তাহার কেন্দ্রানুগ শক্তি এই উদ্দাম বৈচিত্র্যের উল্লাসকে একটিমাত্র পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলাইয়া রাখিয়াছে। এই যে একদিকে ফুটিয়া পড়া

এবং আর একদিকে আঁটিয়া-ধরা, ইহারই ছন্দে ছন্দে সৌন্দর্য্য,—বিশ্বের মধ্যে এই ছাড়-দেওয়া এবং টান রাখার নিত্য লীলাতেই সুন্দর আপনাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছেন। যাদুকর অনেকগুলি গোলা লইয়া যখন খেলা করে, তখন গোলাগুলিকে একসঙ্গে ছুঁড়িয়া ফেলা এবং লুফিয়া-ধরার দ্বারাই আশ্চর্য্য চাতুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহার মধ্যে যদি কোনো একটা গোলার কেবল ক্ষণকালীন অবস্থা আমাদের চোখে পড়ে, তবে হয় তাহার ওঠা নয় পড়া দেখি—তাহাতে দেখার পূর্ণতা হয় না বলিয়া আনন্দের পূর্ণতা ঘটে না। জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পূর্ণতররূপে দেখি, ততই জানিতে পারি, ভালমন্দ, সুখদুঃখ, জীবনমৃত্যু সমস্তই উঠিয়া ও পড়িয়া বিশ্বসঙ্গীতের ছন্দ রচনা করিতেছে—সমগ্রভাবে দেখিলে এই ছন্দের কোথাও বিচ্ছেদ নাই। সৌন্দর্য্যের কোথাও লাঘবতা নাই। জগতের মধ্যে সৌন্দর্য্যকে এইরূপ সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্য্যবোধের শেষ লক্ষ্য। মানুষ তেম্‌নি করিয়া দেখিবার দিকে যতই অগ্রসর হইতেছে, তাহার আনন্দকে ততই জগতের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিতেছে—পূর্ব্বে যাহা নিরর্থক ছিল ক্রমেই তাহা সার্থক হইয়া উঠিতেছে, পূর্ব্বে সে যাহার প্রতি উদাসীন ছিল ক্রমে সে তাহাকে আপনার সঙ্গে মিলাইয়া লইতেছে, এবং যাহাকে বিরুদ্ধ বলিয়া জানিত তাহাকে বৃহতের মধ্যে দেখিয়া তাহার ঠিক স্থানটিকে দেখিতে পাইতেছে ও তৃপ্তিলাভ করিতেছে। বিশ্বের সমগ্রের মধ্যে মানুষের এই সৌন্দর্য্যকে দেখার বৃত্তান্ত, জগৎকে তাহার আনন্দের দ্বারা অধিকার করিবার ইতিহাস মানুষের সাহিত্যে আপনা-আপনি রক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু সৌন্দর্য্যকে অনেক সময় আমরা নিখিল সত্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেখি এবং তাহাকে লইয়া দল বাঁধিয়া বেড়াই, ইহা দেখিতে

পাওয়া যায়। য়ুরোপে সৌন্দর্য্যচর্চ্চা, সৌন্দর্য্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে। সৌন্দর্য্যের বিশেষভাবের অনুশীলনটা যেন একটা বিশেষ বাহাছুরির কাজ, এইরূপ ভঙ্গীতে একদল লোক তাহার জয়ধ্বজা উড়াইয়া বেড়ায়। স্বয়ং ঈশ্বরকেও এইরূপ নিজের বিশেষ দলভুক্ত করিয়া বড়াই করিয়া এবং অন্য দলের সঙ্গে লড়াই করিয়া-বেড়াইতে মানুষকে দেখা গিয়াছে।

বলা বাহুল্য, সৌন্দর্য্যকে চারিদিক্ হইতে বিশেষ করিয়া লইয়া জগতে আর সমস্ত ডিঙাইয়া কেবল তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ানো সংসারের পনেরো-আনা লোকের কর্ম্ম নহে। কেবলি সুন্দর-অসুন্দর বাঁচাইয়া জৈন তপস্বীদের মত প্রতিপদক্ষেপের হিসাব লইয়া চলিতে গেলে চলাই হয় না।

পৃথিবীতে, কি সৌন্দর্য্যে, কি শুচিতায়, যাহাদের হিসাব নিরতিশয় সূক্ষ্ম, তাহারা মোটাহিসাবের লোকদিগকে অবজ্ঞা করে। তাহাদিগকে বলে গ্রাম্য। মোটা-হিসাবের লোকেরা সসঙ্কোচে তাহা স্বীকার করিয়া লয়।

য়ুরোপের সাহিত্যে, সৌন্দর্য্যের দোহাই দিয়া, যাহা-কিছু প্রচলিত, যাহা-কিছু প্রাকৃত, তাহাকে তুচ্ছ, তাহাকে hum-drum বলিয়া একেবারে ঝাঁটাইয়া দিবার চেষ্টা কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায়। আমার বেশ মনে আছে—অনেকদিন হইল, কোনো বড় লেখকের লেখা একখানি ফরাসী-বহির ইংরেজি তর্জ্জমা পড়িয়াছিলাম। সে বইখানি নামজাদা। কবি সুইন্‌বরন্ তাহাকে Gospel of Beauty অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের ধর্ম্মশাস্ত্র উপাধি দিয়াছেন। তাহাতে একদিকে একজন পুরুষ ও আর একদিকে একজন স্ত্রীলোক আপনার সম্পূর্ণ মনের মতনকে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর মধ্যে খুঁজিয়া বেড়ানোকেই জীবনের ব্রত করিয়াছে। সংসারের যাহা-কিছু প্রতিদিনের, যাহা-কিছু চারিদিকের

যাহা-কিছু সাধারণ, তাহা হইতে কোনোমতে আপনাকে বাঁচাইয়া, অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার সামান্যতাকে পদে-পদে অপমান করিয়া সমস্ত বইখানির মধ্যে আশ্চর্য্য লিপিচাতুর্য্যের সহিত রঙের পর রং, সুরের পর সুর চড়াইয়া সৌন্দর্য্যের একটি অতি দুর্লভ উৎকর্ষের প্রতি একটি অতি তীব্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করা হইয়াছে। আমার ত মনে হয়, এমন নিষ্ঠুর বই আমি পড়ি নাই। আমার কেবলি মনে হইতেছিল, সৌন্দর্য্যের টান মানুষের মনকে যদি সংসার হইতে এমনই করিয়া ছিনিয়া লয়, মানুষের বাসনাকে তাহার চারিদিকের সহিত যদি কোনোমতেই থাপ্ খাইতে না দেয়, যাহা প্রচলিত তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রচার করে, যাহা হিতকর তাহাকে গ্রাম্য বলিয়া পরিহাস করিতে থাকে, তবে সৌন্দর্য্যে ধিক্ থাক্। এ যেন আঙুরকে দলিয়া তাহার সমস্ত কান্তি ও রসগন্ধ বাদ দিয়া কেবলমাত্র তাহার মদটুকুকেই চোলাইয়া লওয়া।

সৌন্দর্য্য জাত মানিয়া চলে না—সে সকলের সঙ্গেই মিশিয়া আছে। সে আমাদের ক্ষণকালের মাঝখানেই চিরন্তনকে, আমাদের সামান্যের মুখশ্রীতেই চিরবিস্ময়কে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া দেয়। সমস্ত জগতের যেটি মূল-সুর, সৌন্দর্য্য সেটি আমাদের মনের মধ্যে ধরাইয়া দেয়—সমস্ত সত্যকে তাহার সাহায্যে নিবিড় করিয়া দেখিতে পাই। (একদিন ফাল্গুনমাসের দিনশেষে অতি সামান্য যে একটা গ্রামের পথ দিয়া চলিয়াছিলাম—বিকশিত সর্ষের ক্ষেত হইতে গন্ধ আসিয়া সেই বাঁকা রাস্তা, সেই পুকুরের পাড়, সেই ঝিকিমিকি বিকাল-বেলাটিকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চিরদিনের করিয়া দিয়াছে। যাহাকে চাহিয়া দেখিতাম না, তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছে, যাহাকে ভুলিতাম, তাহাকে ভুলিতে দেয় নাই। সৌন্দর্য্যে আমরা যেটিকে দেখি কেবল সেইটিকেই দেখি এমন নয়, তাহার যোগে আর সমস্তকেই দেখি; মধুর গান

সমস্ত জল-স্থল-আকাশকে, অস্তিত্বমাত্রকেই মর্য্যাদা দান করে। যাঁহারা সাহিত্যবীর, তাঁহারাও অস্তিত্বমাত্রের গৌরবঘোষণা করিবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা ভাষা, ছন্দ ও রচনারীতির সৌন্দর্য্য দিয়া এমন সকল জিনিষকে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করেন, অতিপ্রত্যক্ষ বলিয়াই আমরা যাহাদিগকে চাহিয়া দেখি না। অভ্যাসবশত সামান্যকে আমরা তুচ্ছ বলিয়াই জানি—তাঁহারা সেই সামান্যের প্রতি তাঁহাদের রচনাসৌন্দর্য্যের সমাদর অর্পণ করিবামাত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহা সামান্য নহে, সৌন্দর্য্যের বেষ্টনে তাহার সৌন্দর্য্য ও তাহার মূল্য ধরা পড়িয়াছে। সাহিত্যের আলোকে আমরা অতিপরিচিতকে নূতন করিয়া দেখিতে পাই বলিয়া, সুপরিচিত এবং অপরিচিতকে আমরা একই বিস্ময়পূর্ণ অপূর্ব্বতার মধ্যে গভীর করিয়া উপলব্ধি করি।

কিন্তু মানুষের যখন বিকৃতি ঘটে, তখন সৌন্দর্য্যকে সে তাহার পরিবেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে উল্টা কাজে লাগাইতে থাকে। মাথাকে শরীর হইতে কাটিয়া লইলে সেই কাটামুণ্ড শরীরের যেমন বিরুদ্ধ হয়, এ তেম্‌নি। সাধারণ হইতে বিশেষ করিয়া লইলে সাধারণের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য্যকে দাঁড় করান হয়; তাহাকে সত্যের ঘরশত্রু করিয়া তাহার সাহায্যে সামান্যের প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার উপায় করা হয়। বস্তুত সে জিনিষটা তখন সৌন্দর্য্যের যথার্থ ধর্ম্মই পরিহার করে। ধর্ম্মই বল, সৌন্দর্য্যই বল, যে-কোনো বড় জিনিষই বল না, যখনি তাহাকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া একটু বিশেষ করিয়া লইবার চেষ্টা করা হয়, তখনই তাহার স্বরূপটি নষ্ট হইয়া যায়। নদীকে আমার করিয়া লইবার জন্য বাঁধিয়া লইলে সে আর নদীই থাকে না, সে পুকুর হইয়া পড়ে।

এইরূপে সংসারে অনেকে সৌন্দর্য্যকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তাহাকে ভোগবিলাসের, অহঙ্কারের ও মত্ততার সামগ্রী করিয়া তোলাতেই কোনো

কোনো সম্প্রদায় সৌন্দর্য্যকে বিপদ্‌ বলিয়াই গণ্য করিয়াছে। তাহারা বলে, সৌন্দর্য্য কেবল কনকলঙ্কাপুরী মজাইবার জন্যই আছে।

ঈশ্বরের প্রসাদে বিপদ্‌ কিসে নাই! জলে বিপদ্‌, স্থলে বিপদ্‌, আগুনে বিপদ্‌, বাতাসে বিপদ্‌। বিপদ্‌ই আমাদের কাছে প্রত্যেক জিনিষের সত্য পরিচয় ঘটায়, তাহার ঠিক ব্যবহারটি শিখাইতে থাকে।

ইহার উত্তরে কথা উঠিবে—জলে-স্থলে, আগুনে-বাতাসে আমাদের এত প্রয়োজন যে, তাহাদের নহিলে একমুহূর্ত্ত টিঁকিতে পারি না—সুতরাং সমস্ত বিপদ্‌ স্বীকার করিয়াই তাহাদিগকে সকলরকম করিয়া চিনিয়া লইতে হয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যরসভোগ আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে, সুতরাং তাহা নিছক্‌ বিপদ্‌, অতএব তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই বুঝি—ঈশ্বর আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই সৌন্দর্য্যের মায়ামৃগকে আমাদের সম্মুখে দৌড় করাইতেছেন। ইহার প্রলোভনে আমরা অসাবধান হইলেই জীবনের সারধনটি চুরি যায়।

রক্ষা কর! ঈশ্বর পরীক্ষক এবং সংসার পরীক্ষাস্থল, এই সমস্ত মিথ্যা বিভীষিকার কথা আর সহ্য হয় না। আমাদের নকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের খাঁটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করিয়ো না। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নাই এবং পরীক্ষার কোনো প্রয়োজনই নাই। সে বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র শিক্ষাই আছে। সেখানে কেবল বিকাশেরই ব্যাপার চলিতেছে। সেই জন্যই মানুষের মনে সৌন্দর্য্যবোধ যে এমন প্রবল হইয়াছে, সে আমাদের বিকাশ ঘটাইবে বলিয়াই। বিপদ্‌ থাকেত থাক্‌, তাই বলিয়া বিকাশের পথকে একবারে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে মঙ্গল নাই।

বিকাশ বলিতে কি বুঝায়, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যতরকম করিয়া যতদূর ব্যাপ্ত হইতে থাকে, ততই প্রত্যেকের বিকাশ। স্বর্গরাজ ইন্দ্র যদি আমাদের সেই যোগসাধনের

বিঘ্ন ঘটাইবার জন্যই সৌন্দর্য্যকে মর্ত্ত্যে পাঠাইয়া দেন, ইহা সত্য হয়, তবে ইন্দ্রদেবের সেই প্রবঞ্চনাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া দুই চক্ষু মুদিয়া থাকাই শ্রেয়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু ইন্দ্রদেবের প্রতি আমার লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই। তাঁহার কোনো দূতকেই মারিয়া খেদাইতে হইবে, এমন কথা আমি বলিতে পারিব না। এ কথা নিশ্চয় জানি, সত্যের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের প্রগাঢ় এবং অখণ্ড মিলন ঘটাইবার জন্যই সৌন্দর্য্যবোধ হাসিমুখে আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। সে কেবল বিনা-প্রয়োজনের মিলন—সে কেবলমাত্র আনন্দের মিলন। নীলাকাশ যখন নিতান্তই শুধুশুধু আমাদের হৃদয় দখল করিয়া সমস্ত শ্যামল পৃথিবীর উপর তাহার জ্যোতির্ম্ময় পীতাম্বরটি ছড়াইয়া দেয়, তখনি আমরা বলি, সুন্দর। বসন্তে গাছের নূতন কচিপাতা বনলক্ষ্মীদের আঙুলগুলির মত যখন একেবারেই বিনা আবশ্যকে আমাদের দুই চোখকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতে থাকে, তখনি আমাদের মনে সৌন্দর্য্যরস উছলিয়া উঠে।

কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধ কেবল সুন্দরনামক সত্যের একটা অংশের দিকেই আমাদের হৃদয়কে টানে ও বাকি অংশ হইতে আমাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া দেয়, তাহার এই অন্যায় বদ্‌নাম কেমন করিয়া ঘুচান যাইবে, সেই কথাই ভাবিতেছি।

আমাদের জ্ঞানশক্তিই কি জগতের সমস্ত সত্যকেই এখনি আমাদের জানার মধ্যে আনিয়াছে? আমাদের কর্ম্মশক্তিই কি জগতের সমস্ত শক্তিকে আজই আমাদের ব্যবহারের আয়ত্ত করিয়াছে? জগতের এক অংশ আমাদের জানা, অধিকাংশই অজানা, বিশ্বশক্তির সামান্য অংশ আমাদের কাজে খাটিতেছে, অধিকাংশকেই আমরা ব্যবহারে লাগাইতে পারি নাই। তা হউক, তবু আমাদের জ্ঞান সেই জানা-জগৎ ও না-জানা জগতের দ্বন্দ্ব প্রতিদিন একটু একটু ঘুচাইয়া চলিয়াছে—যুক্তিজাল

বিস্তার করিয়া জগতের সমস্ত সত্যকে ক্রমে আমাদের বুদ্ধির অধিকারে আনিতেছে ও জগৎকে আমাদের মনের জগৎ, আমাদের জ্ঞানের জগৎ করিয়া তুলিতেছে; আমাদের কর্ম্মশক্তি জগতের সমস্ত শক্তিকে ব্যবহারের দ্বারা ক্রমে ক্রমে আপন করিয়া তুলিতেছে এবং বিদ্যুৎ-জল-অগ্নি-বাতাস দিনে দিনে আমাদেরই বৃহৎ কর্ম্মশরীর হইয়া উঠিতেছে। আমাদের সৌন্দর্য্যবোধও ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগৎকে আমাদের আনন্দের জগৎ করিয়া তুলিতেছে—সেইদিকেই তাহার গতি। জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাপ্ত হইবে, কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে এবং সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার আনন্দ ব্যাপ্ত হইবে, মনুষ্যত্বের ইহাই লক্ষ্য। অর্থাৎ জগৎকে জ্ঞানরূপে পাওয়া, শক্তিরূপে পাওয়া ও আনন্দরূপে পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।

কিন্তু পাওয়া-না-পাওয়ার বিরোধের ভিতর দিয়া ছাড়া পাওয়া যাইতেই পারে না; দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ছাড়া বিকাশ হইতেই পারে না, সৃষ্টির গোড়াকার এই নিয়ম। একের দুই হওয়া এবং দুয়ের এক হইতে থাকাই বিকাশ।

বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখ। মানুষের একদিন এমন অবস্থা ছিল, যখন সে গাছে, পাথরে, মানুষে, মেঘে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, নদীতে, পর্ব্বতে প্রাণি-অপ্রাণীর ভেদ দেখিতে পাইত না। তখন সবই তাহার কাছে যেন সমান-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। ক্রমে তাহার বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিতে প্রাণী ও অপ্রাণীর ভেদ একান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে অভেদ হইতে প্রথমে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। তাহা যদি না হইত, তবে প্রাণের প্রকৃত লক্ষণগুলিকে সে কোনোদিন জানিতেই পারিত না। এদিকে লক্ষণ-গুলিকে যতই সে সত্য করিয়া জানিতে লাগিল, দ্বন্দ্ব ততই দূরে সরিয়া যাইতে থাকিল। প্রথমে প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝখানের গণ্ডিটা ঝাপ্সা হইয়া আসিল; কোথায় উদ্ভিদের শেষ ও প্রাণীর আরম্ভ, তাহা আর

ঠাহর করা যায় না। তাহার পরে আজ, ধাতুদ্রব্য—যাহাকে জড় বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি—তাহার মধ্যেও প্রাণের লক্ষণ বিজ্ঞানের চক্ষে ধরা দিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব যে ভেদবুদ্ধির সাহায্যে আমরা প্রাণ-জিনিষটাকে চিনিয়াছি, চেনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভেদটা ক্রমেই লুপ্ত হইতে থাকিবে, অভেদ হইতে দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব হইতেই ঐক্য বাহির হইবে এবং অবশেষে বিজ্ঞান একদিন উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে সমান সুরে বলিবে—"সর্ব্বং প্রাণ এজতি"—সমস্তই প্রাণে কম্পিত হইতেছে।

যেমন সমস্তই প্রাণে কাঁপিতেছে, তেম্‌নি সমস্তই আনন্দ, উপনিষদ্ একথাও বলিয়াছেন। জগতের এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপ দেখিবার পথে সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা প্রথমে একান্ত হইয়া মাথা তোলে। নহিলে সুন্দরের পরিচয় ঘটা একেবারে অসম্ভব।

আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের প্রথমাবস্থায় সৌন্দর্য্যের একান্ত স্বাতন্ত্র্য আমাদিগকে যেন ঘা মারিয়া জাগাইতে চায়। এই জন্য বৈপরীত্য তাহার প্রথম অস্ত্র। খুব একটা টক্‌টকে রং, খুব একটা গঠনের বৈচিত্র্য নিজের চারিদিকের ম্লানতা হইতে যেন ফুঁড়িয়া-উঠিয়া আমাদিগকে হাঁক দিয়া ডাকে। সঙ্গীত কেবল উচ্চশব্দের উত্তেজনা আশ্রয় করিয়া আকাশ মাৎ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। অবশেষে সৌন্দর্য্যবোধ যতই বিকাশ পায়, ততই স্বাতন্ত্র্য নহে সুসঙ্গতি, আঘাত নহে আকর্ষণ, আধিপত্য নহে সামঞ্জস্য—আমাদিগকে আনন্দদান করে। এইরূপে সৌন্দর্য্যকে প্রথমে চারিদিক্ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া সৌন্দর্য্যকে চিনিবার চর্চ্চা করি, তাহার পরে সৌন্দর্য্যকে চারিদিকের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া চারিদিক্‌কেই সুন্দর বলিয়া চিনিতে পারি।

একটুখানির মধ্যে দেখিলে আমরা অনিয়ম দেখি, চারিদিকের সঙ্গে অখণ্ড করিয়া মিলাইয়া দেখিলেই নিয়ম আমাদের কাছে ধরা পড়ে;

তখন,—যদি-চ ধোঁয়া আকাশে উড়িয়া যায় ও ঢেলা মাটিতে পড়ে, সোলা জলে ভাসে ও লোহা জলে ডোবে, তবু এই সমস্ত দ্বৈতের মধ্যে ভারাকর্ষণের এক নিয়মের কোথাও বিচ্ছেদ দেখি না।

জ্ঞানকে ভ্রমমুক্ত করিবার এই যেমন উপায়, তেমনি আনন্দকেও বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে খণ্ডতা হইতে ছুটি দিয়া সমগ্রের সহিত যুক্ত করিতে হইবে। যেমন উপস্থিত যাহাই প্রতীতি হয়, তাহাকেই সত্য বলিয়াই ধরিয়া লইলে বিজ্ঞানে বাধে, তেম্‌নি উপস্থিত যাহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তাহাকেই সুন্দর বলিয়া ধরিয়া লইলে আনন্দের বিঘ্ন ঘটে। আমাদের প্রতীতিকে নানাদিক্ দিয়া সর্ব্বত্র যাচাই করিয়া লইলে তবেই তাহার সত্যতা স্থির হয়—তেম্‌নি আমাদের অনুভূতিকেও তখনি আনন্দ বলিতে পারি, যখন সংসারের সকল দিকেই সে মিশ খায়। মাতাল মদ খাইয়া যতই সুখবোধ করুক্, নানা দিকেই সে সুখের বিরোধ;—তাহার আপনার সুখ, অন্যের দুঃখ, তাহার আজিকার সুখ, কালিকার দুঃখ, তাহার প্রকৃতির এক অংশের সুখ, প্রকৃতির অন্য অংশের দুঃখ। অতএব এ সুখে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, আনন্দভঙ্গ হয়। প্রকৃতির সমস্ত সত্যের সঙ্গে ইহার মিল হয় না।

নানা দ্বন্দ্ব, নানা সুখদুঃখের ভিতর দিয়া মানুষ সুন্দরকে, আনন্দকে সত্যের সব দিকে ছড়াইয়া বৃহৎ করিয়া চিনিয়া লইতেছে। তাহার এই চেনা কোথায় সঞ্চিত হইতেছে? জগদ্ব্যাপারসম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেকদিন হইতে অনেক লোকের দ্বারা স্মৃতিবদ্ধ হইয়া বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়া তুলিতেছে—এই সুযোগে একজনের দেখা আর একজনের দেখার সঙ্গে, এককালের দেখা আর এক কালের দেখার সঙ্গে পরখ করিয়া লইবার সুবিধা হয়। এমন নহিলে বিজ্ঞান পাকা হইতেই পারে না। তেম্‌নি মানুষ কর্তৃক সুন্দরের পরিচয়, আনন্দের পরিচয়, দেশে দেশে কালে কালে সাহিত্যে সঞ্চিত হইতেছে। সত্যের উপরে

মানুষের হৃদয়ের অধিকার কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে—সুখবোধ কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ক্রমে প্রসারিত হইয়া মানুষের সমস্ত মন, ধর্ম্মবুদ্ধি ও হৃদয়কে অধিকার করিয়া লইতেছে ও এম্নি করিয়া ক্ষুদ্রকেও মহৎ এবং দুঃখকেও প্রিয় করিয়া তুলিতেছে—মানুষ নিয়তই আপনার সাহিত্যে সেই পথের চিহ্ন রাখিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা বিশ্বসাহিত্যের পাঠক, তাঁহারা সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই রাজপথটির অনুসরণ করিয়া—সমস্ত মানুষ হৃদয় দিয়া কি চাহিতেছে ও হৃদয় দিয়া কি পাইতেছে, সত্য কেমন করিয়া মানুষের কাছে মঙ্গলরূপ ও আনন্দরূপ ধরিতেছে—তাহাই সন্ধান করিয়া ও অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, মানুষ কি জানে, তাহাতে নয়, কিন্তু মানুষ কিসে আনন্দ পায়, তাহাতেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের সেই পরিচয়ই আমাদের কাছে ঔৎসুক্যজনক। যখন দেখি, সত্যের জন্য কেহ নির্ব্বাসন স্বীকার করিতেছে, তখন সেই বীরপুরুষের আনন্দের পরিধি আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেখিতে পাই, সে আনন্দ এত বড় জায়গা অধিকার করিয়া আছে যে, নির্ব্বাসন-দুঃখ, অনায়াসে তাহার অঙ্গ হইয়াছে। এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দের মহত্ত্ব প্রমাণ হইতেছে। টাকার মধ্যেই যাহার আনন্দ, সে টাকার ক্ষতির ভয়ে অসত্যকে, অপমানকে অনায়াসে স্বীকার করে; সে চাকরী বজায় রাখিতে অন্যায় করিতে কুণ্ঠিত হয় না;—এই লোকটি যত পরীক্ষাই পাস্ করুক্, ইহার যত বিদ্যাই থাক্, আনন্দশক্তির সীমাতেই ইহার যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের কতখানি আনন্দের অধিকার ছিল, যাহাতে রাজ্যসুখের আনন্দ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, ইহা যখন দেখে, তখন প্রত্যেক মানুষ মনুষ্যত্বের আনন্দ-পরিধির বিপুলতা দেখিয়া যেন নিজেরই গুপ্তধন অন্যের মধ্যে আবিষ্কার

করে—নিজেরই বাধামুক্ত পরিচয় বাহিরে দেখিতে পায়। এই মহৎ-চরিত্রে আনন্দবোধ করাতে আমরা নিজেকেই আবিষ্কার করি।

অতএব মানুষ আপনার আনন্দপ্রকাশের দ্বারা সাহিত্যে কেবল আপনারই নিত্যরূপ, শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করিতেছে।

আমি জানি, সাহিত্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রমাণ আহরণ করিয়া আমার মোট-কথাটাকে খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলা অত্যন্ত সহজ। সাহিত্যের মধ্যে যেখানে যাহা-কিছু স্থান পাইয়াছে, তাহার সমস্তটার জবাবদিহি করিবার দায় যদি আমার উপরে চাপানো হয়, তবে সে আমার বড় কম বিপদ্ নয়। কিন্তু মানুষের সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে শত শত আত্মবিরোধ থাকে। যখন বলি, জাপানীরা নির্ভীক সাহসে লড়াই করিয়াছিল—তখন জাপানী সেনাদলের প্রত্যেক লোকটির সাহসের হিসাব লইতে গেলে নানা স্থানেই ত্রুটি দেখা যাইবে—কিন্তু ইহা সত্য, সেই সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের ভয়কেও সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া জাপানীদের সাহস যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে। সাহিত্যে মানুষ বৃহৎভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে—সে ক্রমশই তাহার আনন্দকে খণ্ড হইতে অখণ্ডের দিকে অগ্রসর করিয়া ব্যক্ত করিতেছে—বড় করিয়া দেখিলে এ কথা সত্য—বিকৃতি এবং ত্রুটি যতই থাক্, তবু সব লইয়াই এ কথা সত্য।

একটি কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে,—সাহিত্য দুইরকম করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়। এক, সে সত্যকে মনোহররূপে আমাদিগকে দেখায়, আর সে সত্যকে আমাদের গোচর করিয়া দেয়। সত্যকে গোচর করানো বড় শক্ত কাজ। হিমালয়ের শিখর কত-হাজার ফিট্ উঁচু, তাহার মাথায় কতখানি বরফ আছে, তাহার কোন্ অংশে কোন্ শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মে, তাহা তন্নতন্ন করিয়া বলিলেও হিমালয় আমাদের গোচর হয় না। যিনি কয়েকটি কথায় এই হিমালয়কে

আমাদের গোচর করিয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা কবি বলি। হিমালয় কেন, একটা পানাপুকুরকেও আমাদের মনশ্চক্ষুর সাম্‌নে ধরিয়া দিলে আমাদের আনন্দ হয়। পানাপুকুরকে চোখে আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাকেই ভাষার ভিতর দিয়া দেখিলে তাহাকে নূতন করিয়া দেখা হয়;—মন চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়া যেটাকে দেখিতে পায়, ভাষা যদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া সেইটেকেই দেখাইতে পারে, তবে মন তাহাতে নূতন একটা রসলাভ করে। এইরূপে সাহিত্য আমাদের নূতন একটি ইন্দ্রিয়ের মত হইয়া জগৎকে আমাদের কাছে নূতন করিয়া দেখায়। কেবল নূতন নয়;—ভাষার একটা বিশেষত্ব আছে;—সে মানুষের নিজের জিনিষ—সে অনেকটা আমাদের মন-গড়া;—এই জন্য বাহিরের যে-কোনো জিনিষকে সে আমাদের কাছে আনিয়া দেয়, সেটাকে যেন বিশেষ করিয়া মানুষের জিনিষ করিয়া তোলে। ভাষা যে ছবি আঁকে, সে ছবি যে যথাযথ ছবি বলিয়া আমাদের কাছে আদর পায়, তাহা নহে—ভাষা যেন তাহার মধ্যে একটা মানবরস মিশাইয়া দেয়, এইজন্য সে ছবি আমাদের হৃদয়ের কাছে একটা বিশেষ আত্মীয়তা লাভ করে। বিশ্বজগৎকে ভাষা দিয়া মানুষের ভিতর দিয়া চালাইয়া লইলে সে আমাদের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।

শুধু তাই নয়, ভাষার মধ্য দিয়া যে ছবি আমাদের কাছে আসে, সে সমস্ত খুঁটিনাটি লইয়া আসে না। সে কেবল ততটুকুই আসে, যতটুকুতে সে একটি বিশেষ সমগ্রতা লাভ করে। এইজন্য তাহাকে একটি অখণ্ডরসের সঙ্গে দেখিতে পাই—কোনো অনাবশ্যক বাহুল্য সেই রস ভঙ্গ করে না। সেই সুসম্পূর্ণ রসের ভিতর দিয়া দেখাতেই সে ছবি আমাদের অন্তঃকরণের কাছে এত অধিক করিয়া গোচর হইয়া উঠে।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্তের যে বর্ণনা আছে, সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড় দিক্ দেখানো হইয়াছে, তাহা নহে—এই

রকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লী করিতে মজবুৎ লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্ত্তিমান্ করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন একটু কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদেরও হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষসংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ু-দত্তের যতটুকু আবশ্যক, কবি তাহার চেয়ে বেশি কিছুই দেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ-সংসারের ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ঐটুকুমাত্র নয়—এইজন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। কোনো-একটা সমগ্রভাবে সে আমাদের কাছে গোচর হয় না বলিয়াই আমরা তাহাতে আনন্দ পাই না। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।

ভাঁড়ুদত্ত যেমন, চরিত্রমাত্রই সেইরূপ। রামায়ণের রাম যে কেবল মহান্ বলিয়াই আমাদিগকে আনন্দ দিতেছেন, তাহা নহে, তিনি আমাদের সুগোচর, সেও একটা কারণ। রামকে যেটুকু দেখিলে একটি সমগ্ররসে তিনি আমাদের কাছে জাগিয়া উঠেন, সমস্ত বিক্ষিপ্ততা বাদ দিয়া রামায়ণ কেবল সেইটুকুই আমাদের কাছে আনিয়াছে;—এইজন্য এত স্পষ্ট তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি—এবং স্পষ্ট দেখিতে পাওয়াই মানুষের একটি বিশেষ আনন্দ। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া মানেই একটা কোনো সমগ্রভাবে দেখিতে পাওয়া, যেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাওয়া। সাহিত্য তেম্নি করিয়া একটা সামঞ্জস্যের সুষমার মধ্যে সমস্ত চিত্র দেখায় বলিয়া আমরা আনন্দ পাই। এই সুষমা সৌন্দর্য্য।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্যের একটা বৃহৎ অংশ আছে, যাহা তাহার উপকরণবিভাগ। পূর্ত্তবিভাগে কেবল যে ইমারৎ তৈরি হয়, তাহা নহে, তাহার দ্বারা ইঁটের পাঁজাও পোড়ান হয়। ইঁটগুলি ইমারৎ নয় বলিয়া সাধারণ লোক অবজ্ঞা করিতে পারে, কিন্তু পূর্ত্তবিভাগ তাহার মূল্য জানে। সাহিত্যের যাহা উপকরণ, সাহিত্যরাজ্যে তাহার মূল্য বড় কম নয়। এইজন্যই অনেক সময় কেবল ভাষার সৌন্দর্য্য, কেবল রচনার নৈপুণ্যমাত্রও সাহিত্যে সমাদর পাইয়াছে।

হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ যে কত ব্যাকুল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হৃদয়ের ধর্ম্মই এই, সে নিজের ভাবটিকে অন্যের ভাব করিয়া তুলিতে পারিলে তবে বাঁচিয়া যায়। অথচ কাজটি অত্যন্ত কঠিন বলিয়া তাহার ব্যাকুলতাও অত্যন্ত বেশি। সেইজন্য যখন আমরা দেখি, একটা কথা কেহ অত্যন্ত চমৎকার করিয়া প্রকাশ করিয়াছে, তখন আমাদের এত আনন্দ হয়। প্রকাশের বাধা দূর হওয়াটাই আমাদের কাছে একটা দুর্ম্মূল্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে আমাদের শক্তি বাড়িয়া যায়। যে কথাটা প্রকাশ হইতেছে, তাহা বিশেষ মূল্যবান্ একটা-কিছু না হইলেও সেই প্রকাশ ব্যাপারের মধ্যেই যদি কোনো অসামান্যতা দেখা যায়, তবে মানুষ তাহাকে সমাদর করিয়া রাখে। সেইজন্য যাহা-তাহা অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র প্রকাশ করিবার লীলাবশতই প্রকাশ, সাহিত্যে অনাদৃত হয় নাই। তাহাতে মানুষ যে কেবল আপনার ক্ষমতাকে ব্যক্ত করিয়া আনন্দদান করে, তাহা নহে—কিন্তু যে-কোনো উপলক্ষ্য ধরিয়া শুদ্ধমাত্র আপনার প্রকাশ-ধর্ম্মটাকে খেলানতেই তাহার যে আনন্দ—সেই নিতান্ত বাহুল্য আনন্দকে সে আমাদের মধ্যেও সঞ্চার করিয়া দেয়। যখন দেখি, কোনো মানুষ একটা কঠিন কাজ অবলীলাক্রমে করিতেছে, তখন তাহাতে আমাদের আনন্দ হয়—কিন্তু যখন দেখি, কোনো কাজ নয়, কিন্তু যে-কোনো তুচ্ছ

উপলক্ষ্য লইয়া কোনো মানুষ আপনার সমস্ত শরীরকে নিপুণভাবে চালনা করিতেছে—তখন সেই তুচ্ছ উপলক্ষ্যের গতিভঙ্গীতেই সেই লোকটার যে প্রাণের বেগ, যে উদ্যমের উৎসাহ প্রকাশ পায়, তাহা আমাদের ভিতরকার প্রাণকে চঞ্চল করিয়া সুখ দেয়। সাহিত্যের মধ্যেও হৃদয়ের প্রকাশধর্ম্মের লক্ষ্যহীন নৃত্যচাঞ্চল্য যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। স্বাস্থ্য শ্রান্তিহীন কর্ম্মনৈপুণ্যেও আপনাকে প্রকাশ করে, আবার, স্বাস্থ্য যে কেবলমাত্র স্বাস্থ্য, ইহাই সে বিনা কারণেও প্রকাশ করিয়া থাকে। সাহিত্যে তেম্‌নি মানুষ কেবল যে আপনার ভাবের প্রাচুর্য্যকেই প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা নহে, সে আপনার প্রকাশশক্তির উৎসাহমাত্রকেই ব্যক্ত করিয়া আনন্দ করিতে থাকে। কারণ প্রকাশই আনন্দ—এইজন্যই উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। সাহিত্যেও মানুষ কত বিচিত্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দরূপকে, অমৃতরূপকেই ব্যক্ত করিতেছে, তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়।

সাহিত্যসৃষ্টি।

যেমন একটা সূতাকে মাঝখানে লইয়া মিছরির কণাগুলা দানা বাঁধিয়া উঠে,তেম্‌নি আমাদের মনের মধ্যেও কোনো-একটা সূত্র অবলম্বন করিতে পারিলেই অনেকগুলা বিচ্ছিন্নভাব তাহার চারিদিকে দানা বাঁধিয়া একটা আকৃতিলাভ করিতে চেষ্টা করে। অস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতা, বিচ্ছিন্নতা হইতে সংশ্লিষ্টতার জন্য আমাদের মনের ভিতরে একটা চেষ্টা যেন লাগিয়া আছে। এমন কি, স্বপ্নেও দেখিতে পাই, একটা-কিছু সূচনা পাইবামাত্রই অম্‌নি তাহার চারিদিকে কতই ভাবনা দেখিতে দেখিতে আকার-ধারণ করিতে থাকে। অব্যক্ত ভাবনাগুলা যেন মূর্ত্তিলাভ

করিবার সুযোগ-অপেক্ষায় নিদ্রায়-জাগরণে মনের মধ্যে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দিনের বেলা আমাদের কর্ম্মের সময়—তখন বুদ্ধির কড়াক্কড় পাহারা—সে আমাদের আপিসে বাজে ভিড় করিয়া কোনোমতে কর্ম্মনষ্ট করিতে দেয় না। তাহার আমলে আমাদের ভাবনাগুলা কেবলমাত্র কর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়া অত্যন্ত সুসঙ্গতভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। অবসরের সময় যখন চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, তখনো এই ব্যাপার চলিতেছে। হয় ত একটা ফুলের গন্ধের ছুতা পাইবামাত্র অম্‌নি কতদিনের স্মৃতি তাহার চারিদিকে দেখিতে দেখিতে জমিয়া উঠিতেছে। একটা কথা যেম্‌নি গড়িয়া উঠে, অম্‌নি, তাহাকে আশ্রয় করিয়া যেমন-তেমন করিয়া কত-কি কথা যে পরে পরে আকারধারণ করিয়া চলে, তাহার আর ঠিকানা নাই। আর কিছু নয়, কেবল কোনোরকম করিয়া কিছু-একটা হইয়া উঠিবার চেষ্টা। ভাবনারাজ্যে এই চেষ্টার আর বিরাম নাই।

এই হইয়া উঠিবার চেষ্টা সফল হইলে তার পরে টিকিয়া থাকিবার চেষ্টার পালা। কাঁঠালের গাছে উপযুক্ত সময়ে হুড়াহুড়ি করিয়া ফল ত বিস্তর ধরিল, কিন্তু যে ফলগুলা ছোট ডালে ধরিয়াছে, যাহার বোঁটা নিতান্তই সরু, সে গুলা কোনমতে কাঁঠাললীলা একটুখানি সুরু করিয়াই আবার অব্যক্তের মধ্যে অন্তর্ধান করে।

আমাদের ভাবনাগুলারও সেই দশা। যেটা কোনোগতিকে এমন-একটা সূত্র পাইয়াছে, যাহা টেক্‌সই, সে তাহার পূরা আয়তনে বাড়িয়া উঠিতে পায়—তাহার সমস্ত কোষগুলি ঠিকমত সাজিয়া ও ভরিয়া উঠিতে থাকে—তাহার হওয়াটা সার্থক হয়। আর যেটা কোনমতে একটুখানি ধরিবার জায়গা পাইয়াছে মাত্র, সেটা নেহাৎ তেড়াবাঁকা অসঙ্গতগোছ হইয়া বিদায় লইতে বিলম্ব করে না।

এমন গাছ আছে, যে গাছে বোল ধরিয়াই ঝরিয়া যায়, ফল হইয়া

ওঠা পর্য্যন্ত টেঁকে না! তেমনি এমন মনও আছে, যেখানে ভাবনা কেবলি আসে-যায়, কিন্তু ভাব-আকার ধারণ করিবার পুরা অবকাশ পায় না। কিন্তু ভাবুকলোকের চিত্তে ভাবনাগুলি পুরাপুরি ভাব হইয়া উঠিতে পারে, এমন রস আছে, এমন তেজ আছে। অবশ্য অনেক-গুলা ঝরিয়া পড়ে বটে, কিন্তু কতকগুলা ফলিয়াও উঠে।

গাছে ফল যে-ক'টা ফলিয়া উঠে, তাহাদের এই দরবার হয় যে, ডালের মধ্যে বাঁধা থাকিলেই আমাদের চলিবে না—আমরা পাকিয়া, রসে ভরিয়া, রঙে রঙিয়া, গন্ধে মাতিয়া, আঁটিতে শক্ত হইয়া গাছ ছাড়িয়া বাহিরে যাইব—সেই বাহিরের জমিতে ঠিক অবস্থায় না পড়িতে পাইলে আমাদের সার্থকতা নাই। ভাবুকের মনে ভাবনাগুলা ভাব হইয়া উঠিলে তাহাদেরও সেই দরবার। তাহারা বলে, কোনো সুযোগে যদি হওয়া গেল, তবে এবার বিশ্বমানবের মনের ভূমিতে নব জন্মের এবং চিরজীবনের লীলা করিতে বাহির হইব। প্রথমে ধরিবার সুযোগ তাহার পরে ফলিবার সুযোগ, তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমিলাভ করিবার সুযোগ, এই তিন সুযোগ ঘটিলে পর তবেই মানুষের মনের ভাবনা কৃতার্থ হয়। ভাবনাগুলা সজীব পদার্থের মত সেই কৃতার্থতার তাগিদ মানুষকে কেবলি দিতেছে। সেইজন্য মানুষে মানুষে গলাগলি-কানা-কানি চলিতেছেই। একটা মন আর একটা মনকে খুঁজিতেছে—নিজের ভাবনার ভার নামাইয়া দিবার জন্য—নিজের মনের ভাবকে অন্যের মনে ভাবিত করিবার জন্য। এইজন্য মেয়েরা ঘাটে জমে,—বন্ধুর কাছে বন্ধু ছোটে, চিঠি আনাগোনা করিতে থাকে, এইজন্যই সভাসমিতি, তর্কবিতর্ক, লেখালেখি, বাদপ্রতিবাদ—এমন কি, এজন্য মারামারি-কাটাকাটি পর্য্যন্ত হইতে বাকি থাকে না। মানুষের মনের ভাবনাগুলি সফলতালাভের জন্য ভিতরে ভিতরে মানুষকে এতই প্রচণ্ড তাগিদ দিয়া থাকে; মানুষকে একলা থাকিতে দেয় না; এবং ইহারই

তাড়নায় পৃথিবী জুড়িয়া মানুষ সশব্দে ও নিঃশব্দে দিনরাত কত বকুনিই যে বকিতেছে, তাহার আর ঠিকানা নাই। সেই সকল বকুনি কথায়-বার্তায়, গল্পে-গুজবে, চিঠিপত্রে, মূর্তিতে-চিত্রে, গদ্যে-পদ্যে, কাজে-কর্মে, কত বিচিত্র সাজে, কত বিবিধ আকারে, কত সুসঙ্গত এবং অসঙ্গত আয়োজনে মানুষের সংসারে ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া চলিতেছে, তাহা মনের চক্ষে দেখিলে স্তব্ধ হইতে হয়।

এই যে এক মনের ভাবনার আর-এক মনের মধ্যে সার্থকতালাভের চেষ্টা মানবসমাজ জুড়িয়া চলিতেছে, এই চেষ্টার বশে আমাদের ভাবগুলি স্বভাবতই এমন একটি আকার ধারণ করিতেছে, যাহাতে তাহারা ভাবুকের কেবল একলার না হয়। অনেকসময়ে এ আমাদের অলক্ষিতেই ঘটিতে থাকে। এ কথা বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কোনো বন্ধুর কাছে যখন কথা বলি তখন কথা সেই বন্ধুর মনের ছাঁদে নিজেকে কিছু-না-কিছু গড়িয়া লয়। এক বন্ধুকে আমরা যে-রকম করিয়া চিঠি লিখি, আর এক বন্ধুকে আমরা ঠিক তেমন করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না। আমার ভাবটি বিশেষ বন্ধুর কাছে সম্পূর্ণতালাভ করিবার গূঢ় চেষ্টায় বিশেষমনের প্রকৃতির সঙ্গে কতকটা-পরিমাণে আপোষ করিয়া লয়। বস্তুত আমাদের কথা শ্রোতা ও বক্তা দুইজনের যোগেই তৈরি হইয়া উঠে।

এইজন্য সাহিত্যে লেখক যাহার কাছে নিজের লেখাটি ধরিতেছে— মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেও তাহার প্রকৃতির সঙ্গে নিজের লেখাটি মিলাইয়া লইতেছে। দাশুরায়ের পাঁচালি দাশরথীর ঠিক একলার নহে ;—যে সমাজ সেই পাঁচালি শুনিতেছে, তাহার সঙ্গে যোগে এই পাঁচালি রচিত। এইজন্য এই পাঁচালিতে কেবল দাশরথীর একলার মনের কথা পাওয়া যায় না—ইহাতে একটি বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ-বিরাগ, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-রুচি আপনি প্রকাশ পাইয়াছে।

এম্‌নি করিয়া লেখকদের মধ্যে কেহ বা বন্ধুকে, কেহ বা সম্প্রদায়কে, কেহ বা সমাজকে, কেহ বা সর্ব্বকালের মানবকে আপনার কথা শুনাইতে চাহিয়াছেন। যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদের লেখার মধ্যে বিশেষভাবে সেই বন্ধুর, সম্প্রদায়ের, সমাজের বা বিশ্বমানবের কিছু-না-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এম্‌নি করিয়া সাহিত্য কেবল লেখকের নহে—যাহাদের জন্য লিখিত, তাহাদেরও পরিচয় বহন করে।

বস্তুজগতেও ঠিক জিনিষটি ঠিক জায়গায় যখন আসর জমাইয়া বসে, তখন চারিদিকের আনুকূল্য পাইয়া টিকিয়া যায়—এও ঠিক তেম্‌নি। অতএব যে বস্তুটা টিকিয়া আছে, সে যে কেবল নিজের পরিচয় দেয়, তাহা নয়, সে তাহার চারিদিকের পরিচয় দেয়—কারণ সে কেবল নিজের গুণে নহে, চারিদিকের গুণে টিকিয়া থাকে।

এখন সাহিত্যের সেই গোড়াকার কথা, সেই দানাবাঁধার কথাটা ভাবিয়া দেখ। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাক্।

কত নববর্ষার মেঘ, বলাকার শ্রেণী, তপ্ত ধরণীর 'পরে বারিসেচনের সুগন্ধ—কত-পর্ব্বত-অরণ্য, নদী-নির্ঝর, নগর-গ্রামের উপর দিয়া ঘনপুঞ্জ-গম্ভীর আষাঢ়ের স্নিগ্ধসঞ্চার, কবির মনে কতদিন ধরিয়া কত ভাবের ছায়া, সৌন্দর্য্যের পুলক, বেদনার আভাস রাখিয়া গেছে। কাহার মনেই বা না রাখে! জগৎ ত দিনরাতই আমাদের মনকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে—এবং সেই স্পর্শে আমাদের মনের তারে কিছু-না-কিছু ধ্বনি উঠিতেছেই।

একদা কালিদাসের মনে সেই তাঁহার বহুদিনের বহুতর ধ্বনিগুলি একটি সূত্র অবলম্বন করিবামাত্র একটার পর আর একটা ভিড় করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া কি সুন্দর দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। অনেক দিনের অনেক ভাবের ছবি কালিদাসের মনে এই শুভক্ষণটির জন্য উমেদারি করিয়া বেড়াইয়াছে, আজ তাহারা যক্ষের বিরহবার্ত্তার ছুতাটুকু লইয়া

বর্ণনার স্তরে স্তরে মন্দাক্রান্তার স্তবকে স্তবকে ঘনাইয়া উঠিল। আজ তাহারা একটির যোগে অন্যটি এবং সমগ্রটির যোগে প্রত্যেকটি রক্ষা পাইয়া গেছে।

সতীলক্ষ্মী বলিতে হিন্দুর মনে যে ভাবটি জাগিয়া ওঠে, সে ত আমরা সকলেই জানি। আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই এমন কোনো-না কোনো স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি, যাঁহাকে দেখিয়া সতীত্বের মাহাত্ম্য আমাদের মনকে কিছু-না-কিছু স্পর্শ করিয়াছে। গৃহস্থঘরের প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম্মের তুচ্ছতার মধ্যে কল্যাণের সেই যে দিব্যমূর্ত্তি আমরা ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি, সেই দেখার স্মৃতি ত মনের মধ্যে কেবল আবছায়ার মত ভাসিয়াই বেড়াইতেছে।

কালিদাস কুমারসম্ভবের গল্পটাকে মাঝখানে ধরিতেই সতী নারীর সম্বন্ধে যে সকল ভাব হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা কেমন এক হইয়া শক্ত হইয়া ধরা দিল। ঘরে ঘরে নিষ্ঠাবতী স্ত্রীদের যে সমস্ত কঠোর তপস্যা গৃহকর্ম্মের আড়াল হইতে আভাসে চোখে পড়ে, তাহাই মন্দাকিনীর ধারাধৌত দেবদারুর বনচ্ছায়ায় হিমালয়ের শিলাতলে দেবীর তপস্যার ছবিতে চিরদিনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ—ঐ যেমন বিদ্যাপতির—

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর,—

সেও আমাদের মনের বহুদিনের, অব্যক্তভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা। ভরা-বাদলে ভাদ্রমাসে শূন্যঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কথা না কহিয়া কতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে—যেম্নি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল, অম্নি সকলেরই এই অনেকদিনের কথাটা মূর্ত্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল।

বাষ্প ত হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু ফুলের পাপ্‌ড়ির শীতল স্পর্শটুকু পাইবামাত্র জমিয়া শিশির হইয়া দেখা দেয়। আকাশে বাষ্প ভাসিয়া চলিয়াছিল, দেখা যাইতেছিল না, পাহাড়ের গায়ে আসিয়া ঠেকিতেই মেঘ জমিয়া বর্ষণের বেগে নদী-নির্ঝরিণী বহাইয়া দিল। তেম্‌নি গীতিকবিতায় একটিমাত্র ভাব জমিয়া মুক্তার মত টলটল করিয়া ওঠে, আর বড় বড় কাব্যে ভাবের সম্মিলিত সঙ্ঘ ঝরণায় ঝরিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু মূল কথাটা এই যে, বাষ্পের মত অব্যক্তভাবগুলি কবির কল্পনার মধ্যে এমন একটি স্পর্শলাভ করে যে, দেখিতে দেখিতে তাহাকে ঘেরিয়া বিচিত্রসুন্দর মূর্ত্তি রচনা করিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

বর্ষাঋতুর মত মানুষের সমাজে এমন এক-একটা সময় আসে, যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়া ছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে, কত প্রাচুর্য্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল!

ফরাসীবিদ্রোহের সময়েও তেম্‌নি মানব-প্রেমের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল। তাহাই নানা কবির চিত্তে আঘাত পাইয়া কোথাও বা করুণায়, কোথাও বা বিদ্রোহের সুরে আপনাকে নানামূর্ত্তিতে অজস্র-ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব কথাটা এই, মানুষের মন যে সকল বহুতর অব্যক্তভাবকে নিরন্তর উচ্ছ্বসিত করিয়া দিতেছে—যাহা অনবরত ক্ষণিক বেদনায়, ক্ষণিক ভাবনায়, ক্ষণিক কথায় বিশ্বমানবের সুবিশাল মনোলোকের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—একএকজন কবির কল্পনা একএকটি আকর্ষণকেন্দ্রের মত হইয়া তাহাদেরই মধ্যে

এক এক দলকে কল্পনাসূত্রে এক করিয়া মানুষের মনের কাছে সুস্পষ্ট করিয়া তোলে। তাহাতেই আমাদের আনন্দ হয়। আনন্দ কেন হয়? হয় তাহার কারণ এই, আপনাকে আপনি দেখিবার একটা চেষ্টা সমস্ত মানবমনের মধ্যে কেবলি কাজ করিতেছে—এইজন্য যেখানেই সে কোনো-একটা ঐক্যের মধ্যে নিজের কোনো-একটা বিকাশকে দেখিতে পায়, সেখানেই তাহার এই নিয়তচেষ্টা সার্থক হইয়া তাহাকে আনন্দ দিতে থাকে। কেবল সাহিত্য কেন, দর্শন-ইতিহাসও এইরূপ। দর্শনশাস্ত্রের সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্ত চিন্তা অব্যক্তভাবে সমস্ত মানুষের মনে ছড়াইয়া আছে—দার্শনিকের প্রতিভা তাহাদের মধ্যে কোনো-একটা দলকে কোনো-একটা ঐক্য দিবামাত্র তাহার একটা রূপ, একটা মীমাংসা আমাদের কাছে ব্যক্ত হইয়া উঠে—আমরা নিজেদের মনের চিন্তার একটা বিশেষমূর্ত্তি দেখিতে পাই। ইতিহাস লোকের মুখে মুখে জনশ্রুতি-আকারে ছড়াইয়া থাকে—ঐতিহাসিকের প্রতিভা তাহাদিগকে একটি সূত্রের চারিদিকে বাঁধিয়া তুলিবামাত্র এতকালের অব্যক্ত ইতি-হাসের ব্যক্তমূর্ত্তি আমাদের কাছে ধরা দেয়।

কোন্ কবির কল্পনায় মানুষের হৃদয়ের কোন্ বিশেষরূপ ঘনীভূত হইয়া আপন অনন্ত বৈচিত্র্যের একটা অপরূপ প্রকাশ সৌন্দর্য্যের দ্বারা ফুটাইয়া তুলিল, তাহাই সাহিত্যসমালোচকের বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। কালিদাসের উপমা ভাল বা ভাষা সরস বা কুমারসম্ভবের তৃতীয়সর্গের বর্ণনা সুন্দর বা অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থসর্গে করুণরস প্রচুর আছে, এ আলোচনা যথেষ্ট নহে। কিন্তু কালিদাসের সমস্ত কাব্যে মানবহৃদয়ের একটা বিশেষরূপ বাঁধা পড়িয়াছে। তাঁহার কল্পনা একটা বিশেষ কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আকর্ষণ-বিকর্ষণ-গ্রহণ-বর্জ্জনের নিয়মে মানুষের মনোলোকে কোন্ অব্যক্তকে একটা বিশেষ সৌন্দর্য্যে ব্যক্ত করিয়া তুলিল, সমালোচকের তাহাই বিচার্য্য। কালিদাস জগতে

জন্মগ্রহণ করিয়া, দেখিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, সহিয়াছেন, কল্পনা ও রচনা করিয়াছেন—তাঁহার এই ভাবনা-বেদনা-কল্পনাময় জীবন মানবের অনন্তরূপের একটি বিশেষ রূপকেই বাণীর দ্বারা আমাদের কাছে ব্যক্ত করিয়াছে; সেইটি কি? যদি আমরা প্রত্যেকেই অসাধারণ কবি হইতাম, তবে আমরা প্রত্যেকেই আপনার হৃদয়কে এমন করিয়া মূর্ত্তিমান্ করিতাম, যাহাতে একটি অপূর্ব্বতা দেখা দিত এবং এইরূপে অন্তহীন বিচিত্রই অন্তহীন এককে প্রকাশ করিতে থাকিত। কিন্তু আমাদের সে ক্ষমতা নাই। আমরা ভাঙাচোরা করিয়া কথা বলি—আমরা নিজেকে ঠিকমত জানিই না—যেটাকে আমরা সত্য বলিয়া প্রচার করি, সেটা হয়ত আমাদের প্রকৃতিগত সত্য নহে, তাহা হয় ত দশের মতের অভ্যস্ত আবৃত্তিমাত্র—এইজন্য আমি আমার সমস্ত জীবনটা দিয়া কি দেখিলাম, কি বুঝিলাম, কি পাইলাম, তাহা সমগ্র করিয়া, সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতেই পারি না। কবিরা যে সম্পূর্ণ পারেন, তাহা নহে। তাঁহাদের বাণীও সমস্ত স্পষ্ট হয় না, সত্য হয় না, সুন্দর হয় না—তাঁহাদের চেষ্টা তাঁহাদের প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়কে সকল সময়ে সার্থক করে না;—কিন্তু তাঁহাদের নিজের অগোচরে, তাঁহাদের চেষ্টার অতীত প্রদেশ হইতে একটা বিশ্বব্যাপী গূঢ় চেষ্টার প্রেরণায় সমস্ত বাধা ও অস্পষ্টতার মধ্য হইতে আপনিই একটি মানসরূপ—যাহাকে "ধরি ধরি মনে করি ধর্‌তে গেলে আর মেলে না"—কখনো অল্পমাত্রায়, কখনো অধিকমাত্রায় প্রকাশ হইতে থাকে। যে গূঢ়দর্শী ভাবুক, কবির কাব্যের ভিতর হইতে এই সমগ্ররূপটিকে দেখিতে পান, তিনিই যথার্থ সাহিত্যবিচারক।

আমার এ সকল কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের ভাবের সৃষ্টি একটা খাম্‌-খেয়ালি ব্যাপার নহে, ইহা বস্তুসৃষ্টির মতই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন। প্রকাশের যে-একটা আবেগ আমরা বাহিরের জগতে সমস্ত অণুপরমাণুর ভিতরেই দেখিতেছি—সেই একই আবেগ

আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে প্রবলবেগে কাজ করিতেছে। অতএব যে চক্ষে আমরা পর্ব্বতকানন-নদনদী-মরুসমুদ্রকে দেখি, সাহিত্যকেও সেই চক্ষেই দেখিতে হইবে—ইহাও আমার-তোমার নহে, ইহা নিখিল সৃষ্টিরই একটা ভাগ।

তেমন করিয়া দেখিলে সাহিত্যের কেবল ভালমন্দ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকা যায় না। সেই সঙ্গে তাহার একটা বিকাশের প্রণালী, তাহার একটা বৃহৎ কার্য্যকারণসম্বন্ধ দেখিবার জন্য আগ্রহ জন্মে। আমার কথাটা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

'গ্রাম্যসাহিত্য' নামক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি, দেশের সাধারণ-লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব টুক্‌রা-টুক্‌রা কাব্য হইয়া চারিদিকে ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়। তার পরে একজন কবি সেই টুক্‌রা কাব্যগুলিকে একটা বড় কাব্যের সূত্রে এক করিয়া একটা বড় পিণ্ড করিয়া তোলেন। হরপার্ব্বতীর কত কথা যাহা কোনো পুরাণে নাই, রামসীতার কত কাহিনী যাহা মূলরামায়ণে পাওয়া যায় না—গ্রামের গায়ককথকদের মুখে মুখে পল্লীর আঙিনায় ভাঙা ছন্দ ও গ্রাম্যভাষার বাহনে কতকাল ধরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছে। এমন-সময় কোনো রাজসভার কবি যখন, কুটীরের প্রাঙ্গণে নহে, কোনো বৃহৎ বিশিষ্টসভায় গান গাহিবার জন্য আহূত হইয়াছেন, তখন সেই গ্রাম্যকথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া মার্জ্জিত ছন্দে গম্ভীর ভাষায় বড় করিয়া দাঁড়করাইয়া দিয়াছেন। পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দলাভ করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরো একটা পর্ব্ব যেন অগ্রসর হইয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, এইরূপ শ্রেণীর কাব্য;—তাহা বাংলার ছোট ছোট পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে

বাঁধিবার প্রয়াস। এম্‌নি করিয়া একটা বড় জায়গায় আপনার প্রাণপদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লীসাহিত্য, ফল ধরা হইলেই ফুলের পাপড়িগুলার মত, ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, ইংলণ্ডের আর্থার্‌কাহিনী, স্কান্দিনেবিয়ার সাগাসাহিত্য এম্‌নি করিয়া জন্মিয়াছে—সেইগুলির মধ্যে লোকমুখের বিক্ষিপ্ত কথা এক জায়গায় বড় আকারে দানা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এইরূপ ছড়ানো ভাবের এক হইয়া উঠিবার চেষ্টা মানবসাহিত্যে কয়েক জায়গায় অতি আশ্চর্য্য বিকাশ লাভ করিয়াছে। গ্রীসে হোমরের কাব্য এবং ভারতবর্ষে রামায়ণ মহাভারত।

ইলিয়াড্ এবং অডেসিতে নানা খণ্ডগাথা ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে জোড়া লাগিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে, এ মত প্রায় মোটামুটি সর্ব্বত্রই চলিত হইয়াছে। যে সময়ে লেখা-পুঁথি এবং ছাপা-বইয়ের চলন ছিল না, এবং যখন গায়কেরা কাব্য গান করিয়া শুনাইয়া বেড়াইত, তখন যে ক্রমে নানা কালে ও নানা হাতে একটা কাব্য ভরাট হইয়া উঠিতে থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা নাই। কিন্তু যে কাঠামোর মধ্যে এই কাব্যগুলি খাড়া হইবার জায়গা পাইয়াছে, তাহা যে একজন বড় কবির রচনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, এই কাঠামোর গঠন অনুসরণ করিয়া নূতন নূতন জোড়াগুলি ঐক্যের গণ্ডী হইতে ভ্রষ্ট হইতে পায় নাই।

মিথিলার বিদ্যাপতির গান কেমন করিয়া বাংলা পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে, স্বভাবের নিয়মে এক কেমন করিয়া আর হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীকে বিদ্যাপতির বলা চলে না। মূল কবির প্রায় কিছুই তাহার অধিকাংশ পদেই নাই। ক্রমেই বাঙালী গায়ক ও বাঙালী শ্রোতার যোগে তাহার ভাষা, তাহার অর্থ, এমন কি, তাহার রসেরও পরিবর্ত্তন হইয়া

সে এক নূতন জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রিয়র্সন্ মূল বিদ্যাপতির যে সকল পদ প্রকাশ করিয়াছেন—বাংলা পদাবলীতে তাহার দুটি-চারটির ঠিকানা মেলে—বেশির ভাগই মিলাইতে পারা যায় না। অথচ নানা কাল ও নানা লোকের দ্বারা পরিবর্ত্তনসত্ত্বেও পদগুলি এলোমেলো প্রলাপের মত হইয়া যায় নাই। কারণ, একটা মূলসুর মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত পরিবর্ত্তনকে আপনার করিয়া লইবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছে। সেই সুরটুকুর জোরেই এই পদগুলিকে বিদ্যাপতির পদ বলিতেছি, আবার আগাগোড়া পরিবর্ত্তনের জোরে এগুলিকে বাঙালীর সাহিত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রথমে নানামুখে প্রচলিত খণ্ডগানগুলা একটা কাব্যে বাঁধা পড়িয়া সেই কাব্য আবার যখন বহুকাল ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের কাছে গাওয়া হইতে থাকে, তখন আবার তাহার উপরে নানা দিক্ হইতে নানা কালের হাত পড়িতে থাকে। সেই কাব্য দেশের সকল দিক্ হইতেই আপনার পুষ্টি আপনি টানিয়া লয়। এম্নি করিয়া ক্রমশই তাহা সমস্ত দেশের জিনিষ হইয়া উঠে। তাহাতে সমস্ত দেশের অন্তঃকরণের ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম্মবোধ, কর্ম্মনীতি আপনি আসিয়া মিলিত হয়। যে কবি গোড়ায় ইহার ভিৎ পত্তন করিয়াছেন, তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতাবলেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। তিনি এমন জায়গায় এমন করিয়া গোড়া ফাঁদিয়াছেন, তাঁহার প্ল্যান্টা এতই প্রশস্ত যে, বহুকাল ধরিয়া সমস্ত দেশকে তিনি নিজের কাজে খাটাইয়া লইতে পারেন। এতদিন ধরিয়া এত লোকের হাত পড়িয়া কোথাও যে কিছুই তেড়াবাঁকা হয় না, তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু মূল গঠনটার মাহাত্ম্যে সে সমস্তই অভিভূত হইয়া থাকে।

আমাদের রামায়ণ-মহাভারত, বিশেষভাবে মহাভারত, ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

এইরূপ কালে কালে একটি সমগ্রজাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বভিত্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়।

তাহাকে আমি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর সঙ্গে তুলনা করি। প্রথমে পর্ব্বতের নানা গোপনগুহা হইতে নানা ঝরণা একটা জায়গায় আসিয়া মোটা নদী তৈরি করিয়া তোলে। তার পরে সে যখন আপনার পথে চলিতে থাকে, তখন নানা দেশ হইতে নানা শাখানদী তাহার সঙ্গে মিলিয়া তাহার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

কিন্তু ভারতবর্ষের গঙ্গা, মিশরের নীল ও চীনের ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতির মত মহানদী জগতে অল্পই আছে। এই সমস্ত নদী মাতার মত একটি বৃহৎ দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তকে পালন করিয়া চলিয়াছে। ইহারা একএকটি প্রাচীন সভ্যতার স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর মত।

তেমনি মহাকাব্যও আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল চারিটি-মাত্র আছে। ইলিয়ড্, অডেসি, রামায়ণ ও মহাভারত। অলঙ্কারশাস্ত্রের কৃত্রিম আইনের জোরেই রঘুবংশ, ভারবি, মাঘ বা মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্ট, ভল্টেয়ারের হাঁরিয়াড্ প্রভৃতিকে মহাকাব্যের পংক্তিতে জোর করিয়া বসানো হইয়া থাকে। তাহার পরে এখনকার ছাপাখানার শাসনে মহাকাব্য গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গেছে।

রামায়ণ রচিত হইবার পূর্ব্বে রামচরিত-সম্বন্ধে যে সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্ব্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে যে সকল বীরপুরুষ অবতাররূপে গণ্য হইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জগতের হিতের জন্য কোনো-কোনো অসামান্য কাজ

করিয়াছিলেন। রামায়ণ রচিত হইবার পূর্ব্বে দেশে রামচন্দ্রসম্বন্ধে সেইরূপ একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহই প্রচলিত ছিল। তিনি যে পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নীহরণকারীকে বিনাশ করিয়া স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব প্রমাণ করে বটে, কিন্তু যে অসাধারণ লোকহিত সাধন করিয়া তিনি লোকের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিলেন, রামায়ণে কেবল তাহার আভাস আছে মাত্র।

আর্য্যদের ভারত-অধিকারের পূর্ব্বে যে দ্রাবিড়জাতীয়েরা আদিম-নিবাসীদিগকে জয় করিয়া এই দেশ দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। তাহারা আর্য্যদের কাছে সহজে হার মানে নাই। ইহারা আর্য্যদের যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইত, চাষের ব্যাঘাত করিত, কুলপতিরা অরণ্য কাটিয়া যে এক-একটি আশ্রম স্থাপন করিতেন, সেই আশ্রমে তাহারা কেবলি উৎপাত করিত।

দাক্ষিণাত্যে কোনো দুর্গমস্থানে এই দ্রাবিড়জাতীয় রাজবংশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদেরই প্রেরিত দলবল হঠাৎ বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আর্য্য উপনিবেশগুলিকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

রামচন্দ্র বানরগণকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে দলে লইয়া বহুদিনের চেষ্টায় ও কৌশলে এই দ্রাবিড়দের প্রতাপ নষ্ট করিয়া দেন—এই কারণেই তাঁহার গৌরবগান আর্য্যদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। যেমন শকদের উপদ্রব হইতে হিন্দুদিগকে উদ্ধার করিয়া বিক্রমাদিত্য যশস্বী হইয়াছিলেন, তেমনি অনার্য্যদের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া যিনি আর্য্যদিগকে নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন, তিনিও সাধারণের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং পূজ্য হইয়াছিলেন।

এই উপদ্রব কে দূর করিয়া দিবে, সেই চিন্তা তখন চারিদিকে

জাগিয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বামিত্র অল্পবয়সেই সুলক্ষণ দেখিয়া রামচন্দ্রকেই যোগ্যপাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিশোরবয়স হইতেই রামচন্দ্র এই বিশ্বামিত্রের উৎসাহে ও শিক্ষায় শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত হন। তখনি তিনি আরণ্য গুহকের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া যে প্রণালীতে শত্রুজয় করিতে হইবে, তাহার সূচনা করিতেছিলেন।

গোরু তখন ধন বলিয়া এবং কৃষি পবিত্রকর্ম্মরূপে গণ্য হইত। জনক স্বহস্তে চাষ করিয়াছেন। এই চাষের লাঙল দিয়াই তখন আর্য্যেরা ভারতবর্ষের মাটিকে ক্রমশ আপন করিয়া লইতেছিলেন। এই লাঙ-লের মুখে অরণ্য হঠিয়া গিয়া কৃষিক্ষেত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। রাক্ষ-সেরা এই ব্যাপ্তির অন্তরায় ছিল।

প্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে জনক যে আর্য্যসভ্যতার একজন ধুরন্ধর ছিলেন, নানা জনপ্রবাদে সে কথার সমর্থন করে। ভারতবর্ষে কৃষি-বিস্তারে তিনি একজন উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কন্যারও নাম রাখিয়াছিলেন সীতা। পণ করিয়াছিলেন, যে বীর ধনুক ভাঙিয়া অসামান্য বলের পরিচয় দিবে, তাহাকেই কন্যা দিবেন। সেই অশান্তির দিনে এইরূপ অসামান্য বলিষ্ঠপুরুষের জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যে লোক দাঁড়াইতে পারিবে, তাহাকে বাছিয়া লইবার এই এক উপায় ছিল।

বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অনার্য্যপরাভবব্রতে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে জনকের পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত করিলেন। সেখানে রামচন্দ্র ধনুক ভাঙিয়া তাঁহার ব্রতগ্রহণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন।

তার পর তিনি ছোটভাই ভরতের উপর রাজ্যভার দিয়া মহৎ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য বনে গমন করিলেন। ভরদ্বাজ, অগস্ত্য প্রভৃতি যে সকল ঋষি দুর্গম দক্ষিণে আর্য্যনিবাস-বিস্তারে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাঁহা-

দের উপদেশ লইয়া অনুচর লক্ষ্মণের সঙ্গে অপরিচিত গহন অরণ্যের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সেখানে বালি ও সুগ্রীব নামক দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইয়ের মধ্যে এক ভাইকে মারিয়া অন্য ভাইকে দলে লইলেন। বানরদিগকে বশ করিলেন, তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া সৈন্য গড়িলেন। সেই সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের মধ্যে কৌশলে আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দিলেন। এই রাক্ষসেরা স্থাপত্যবিদ্যায় সুদক্ষ ছিল। যুধিষ্ঠির যে আশ্চর্য্য প্রাসাদ তৈরি করিয়াছিলেন, ময়দানব তাহার কারিকর। মন্দিরনির্ম্মাণে দ্রাবিড়জাতীয়ের কৌশল আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। ইহারাই প্রাচীন ইজিপ্টিয়দের সজাতি বলিয়া যে কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

যাহা হউক, স্বর্ণলঙ্কাপুরীর যে প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছিল, তাহার একটা-কিছু মূল ছিল। এই রাক্ষসেরা অসভ্য ছিল না। বরঞ্চ শিল্প-বিলাসে তাহারা আর্য্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল।

রামচন্দ্র শত্রুদিগকে বশ করিয়াছিলেন, তাহাদের রাজ্য হরণ করেন নাই। বিভীষণ তাঁহার বন্ধু হইয়া লঙ্কায় রাজত্ব করিতে লাগিল। কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যভার বানরদের হাতে দিয়াই চিরদিনের মত তিনি তাহাদিগকে বশ করিয়া লইলেন। এইরূপে রামচন্দ্রই আর্য্যদের সহিত অনার্য্যদের মিলন ঘটাইয়া পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাহারই ফলে দ্রাবিড়গণ ক্রমে আর্য্যদের সঙ্গে এক-সমাজভুক্ত হইয়া হিন্দুজাতি রচনা করিল। এই হিন্দুজাতির মধ্যে উভয়জাতির আচারবিচার-পূজাপদ্ধতি মিশিয়া গিয়া ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হয়।

ক্রমে ক্রমে, আর্য্য-অনার্য্যের মিলন যখন সম্পূর্ণ হইল—পরস্পরের ধর্ম্ম ও বিদ্যার বিনিময় হইয়া গেল, তখন রামচন্দ্রের পুরাতন কাহিনী

মুখে মুখে রূপান্তর ও ভাবান্তর ধরিতে লাগিল। যদি কোনোদিন ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিপূর্ণ মিলন ঘটে, তবে কি ক্লাইবের কীর্ত্তি লইয়া বিশেষভাবে আড়ম্বর করিবার কোনো হেতু থাকিবে, না, ম্যুটিনির উট্রাম্ প্রভৃতি যোদ্ধাদের কাহিনীকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক কোনো উত্তেজনা থাকিতে পারিবে?

যে কবি দেশপ্রচলিত চরিতগাথাগুলিকে মহাকাব্যের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলিলেন, তিনি এই অনার্য্য বশব্যাপারকেই প্রাধান্য না দিয়া মহৎ চরিত্রের এক সম্পূর্ণ আদর্শকে বড় করিয়া তুলিলেন। তিনি করিয়া তুলিলেন বলিলে বোধ হয় ভুল হয়। রামচন্দ্রের পূজ্যস্মৃতি ক্রমে ক্রমে কালান্তর ও অবস্থান্তরের অনুসরণ করিয়া আপনার পূজনীয়তাকে সাধারণের ভক্তিবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। কবি তাঁহার প্রতিভার দ্বারা তাহাকে একজায়গায় ঘনীভূত ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। তখন সর্ব্বসাধারণের ভক্তি চরিতার্থ হইল।

কিন্তু আদিকবি তাহাকে যেখানে দাঁড় করাইয়াছেন, সে যে তাহার পর হইতে সেখানেই স্থির হইয়া আছে, তাহা নহে।

রামায়ণের আদিকবি, গার্হস্থ্য-প্রধান হিন্দুসমাজের যত-কিছু ধর্ম্ম, রামকে তাহারই অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে, ব্রাহ্মণধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তারূপে, অবশেষে রাজারূপে বাল্মীকির রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি যে রাবণকে মারিয়াছিলেন, সেও কেবল ধর্ম্মপত্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য—অবশেষে সেই পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেও কেবল প্রজারঞ্জনের অনুরোধে। নিজের সমুদয় সহজ প্রবৃত্তিকে শাস্ত্রমতে কঠিন শাসন করিয়া সমাজরক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। আমাদের স্থিতিপ্রধান সভ্যতায় পদে পদে যে ত্যাগ, ক্ষমা

ও আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হয়, রামের চরিত্রে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়া রামায়ণ হিন্দুসমাজের মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

আদিকবি যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, তখন যদি-চ রামের চরিতে অতিপ্রাকৃত মিশিয়াছিল, তবু তিনি মানুষেরই আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু অতিপ্রাকৃতকে একজায়গায় স্থান দিলে তাহাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে ক্রমেই বাড়িয়া চলে। এম্‌নি করিয়া রাম ক্রমে দেবতার পদবী অধিকার করিলেন।

তখন রামায়ণের মূল-সুরটার মধ্যে আর একটা পরিবর্ত্তন প্রবেশ করিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রামকে দেবতা বলিলেই তিনি যে সকল কঠিন কাজ করিয়াছিলেন, তাহার দুঃসাধ্যতা চলিয়া যায়। সুতরাং রামের চরিত্রকে মহীয়ান্ করিবার জন্য সেইগুলির বর্ণনাই আর যথেষ্ট হয় না। তখন যে ভাবের দিক্ দিয়া দেখিলে দেবচরিত্র মানুষের কাছে প্রিয় হয়, কাব্যে সেই ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠে।

সেই ভাবটি ভক্তবৎসলতা। কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম-পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহকচণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাঁহার ভক্ত। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার কাছ হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।

ভারতবর্ষে এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে এই একটা ঢেউ উঠিয়াছিল। ঈশ্বরের অধিকার যে কেবল জ্ঞানীদিগেরই নহে, এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে যে তন্ত্রমন্ত্র ও বিশেষ-বিধির প্রয়োজন করে না, কেবল

সরল ভক্তির দ্বারাই আপামর চণ্ডাল সকলেই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে, এই কথাটা হঠাৎ যেন একটা নূতন আবিষ্কারের মত আসিয়া ভারতের জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তখন যে সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণের এই নূতন গৌরব-লাভের সাহিত্য। কালকেতু, ধনপতি, চাঁদসদাগর প্রভৃতি সাধারণলোকেই তাহার নায়ক ;—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় নহে, মানিজ্ঞানী সাধক নহে, সমাজে যাহারা নীচে পড়িয়া আছে, দেবতা যে তাহাদেরও দেবতা, ইহাই সাহিত্য নানাভাবে প্রচার করিতেছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও এই ভাবটি ধরা দিয়াছে। ভগবান্ যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনাচারী বানরদেরও বন্ধু, কাঠবিড়ালীর অতি সামান্য সেবাও যে তাঁহার কাছে অগ্রাহ্য হয় না, পাপিষ্ঠ রাক্ষসকেও যে তিনি যথোচিত শাস্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া উদ্ধার করেন, এই ভাবটিই কৃত্তিবাসে প্রবল হইয়া ভারতবর্ষে রামায়ণ-কথার ধারাকে গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর ন্যায় আর একটা বিশেষ পথে লইয়া গেছে।

রামায়ণকথার যে ধারা আমরা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি, তাহারই একটি অত্যন্ত আধুনিক শাখা মেঘনাদবধকাব্যের মধ্যে রহিয়াছে। এই কাব্য সেই পুরাতন কথা অবলম্বন করিয়াও বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস হইতে একটি বিপরীত প্রকৃতি ধরিয়াছে।

আমরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকি যে, ইংরেজি শিখিয়া যে সাহিত্য আমরা রচনা করিতেছি, তাহা খাঁটিজিনিষ নহে—অতএব এ সাহিত্য যেন দেশের সাহিত্য বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য নয়।

যে জিনিষটা একটা-কোনো স্থায়ী বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, যাহার আর কোনো পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই যদি খাঁটিজিনিষ বলা হয়, তবে সজীব প্রকৃতির মধ্যে সে জিনিষটা কোথাও নাই।

মানুষের সমাজে ভাবের সঙ্গে ভাবের মিলন হয় এবং সে মিলনে নূতন নূতন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইতে থাকে। ভারতবর্ষে এমন মিলন কত ঘটিয়াছে, আমাদের মন কত পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া আসিয়াছে, তাহার কি সীমা আছে! অল্পদিন হইল মুসলমানেরা যখন আমাদের দেশের রাজসিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছিল, তাহারা কি আমাদের মনকে স্পর্শ করে নাই? তাহাদের সেমেটিক্-ভাবের সঙ্গে হিন্দুভাবের কোনো স্বাভাবিক সম্মিশ্রণ কি ঘটিতে পায় নাই? আমাদের শিল্পসাহিত্য, বেশ-ভূষা, রাগরাগিণী, ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে মুসলমানের সামগ্রী মিশিয়াছে। মনের সঙ্গে মনের এ মিলন না হইয়া থাকিতে পারে না। যদি এমন হয় যে, কেবল আমাদেরই মধ্যে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে, তবে সে আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা।

য়ুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্ত-বৃত্তির প্রতি অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে। এইরূপ ভাবের মিলনে যে একটা ব্যাপার উৎপন্ন হইয়া উঠিতেছে—কিছুকাল পরে তাহার মূর্ত্তিটা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবার সময় আসিবে।

য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, এ কথা যখন সত্য, তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না-কিছু নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোনোমতেই হইতে পারে না—যদি হয়, তবেই এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।

মেঘনাদবধকাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই।

এ পরিবর্ত্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রামরাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনের মধ্যে যে একটা বাঁধাবাধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রামলক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্ম্মভীরুতা সর্ব্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভাল ও কতটুকু মন্দ, তাহা কেবলি অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য ; ইহার হর্ম্মাচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে ; ইহার রথ-রথি-অশ্বে-গজে পৃথিবী কম্পমান ; ইহা স্পর্দ্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে ; যাহা চায়, তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে ; তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটলশক্তি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না,—কবি সেই ধর্ম্ম-বিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্দ্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যে পার্থিব-

মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হই-য়াছে—তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘনঘন গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়াছে;—এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিককালে রামায়ণকথার একটি নূতন বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, একি কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে হইল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে,—দুর্ব্বলের অভিমানবশত ইহাকে আমরা স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি,—তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।

রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া আমি এই কথাটা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, মানুষের সাহিত্যে যে একটা ভাবের সৃষ্টি চলিতেছে, তাহার স্থিতিগতির ক্ষেত্র অতি বৃহৎ। তাহা দেখিতে আকস্মিক; এই চৈত্র-মাসে যে ঘনঘন এত বৃষ্টি হইয়া গেল, সেও ত আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কত সুদূর পশ্চিম হইতে কারণপরম্পরার দ্বারা বাহিত হইয়া কোথাও বা বিশেষ সুযোগ, কোথাও বা বিশেষ বাধা পাইয়া সেই বৃষ্টি আমার ক্ষেত্রকে অভিষিক্ত করিয়া দিল। ভাবের প্রবাহও তেম্‌নি করিয়াই বহিয়া চলিয়াছে;—সে ছোট-বড় কত কারণের দ্বারা খণ্ড হইতে এক এবং এক হইতে শতধা হইয়া কত রূপরূপান্তরে ছড়া-ইয়া পড়িতেছে। সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানসসৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে। তাহার কত রূপ, কত রস, কতই বিচিত্র গতি!

লেখককে যখন আমরা অত্যন্ত নিকটে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি, তখন লেখকের সঙ্গে লেখার সম্বন্ধটুকুই আমাদের কাছে প্রবল হইয়া উঠে—তখন মনে করি, গঙ্গোত্রীই যেন গঙ্গাকে সৃষ্টি করিতেছে। এইজন্য

জগতের যে সকল কাব্যের লেখক কে, তাহার যেন ঠিকানা নাই—যে সকল কাব্য আপনাকেই যেন আপনি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, অথচ যাহার সূত্র ছিন্ন হইয়া যায় নাই, সেই সকল কাব্যের দৃষ্টান্ত দিয়া আমি ভাবসৃষ্টির বিপুল নৈসর্গিকতার প্রতি আপনাদের মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

১৩১৪।

বাংলা জাতীয় সাহিত্য।*

সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে ভাবে ভাষায় ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তাহা নহে,—মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীববন্ধনে সংযুক্ত নহে—তাহারা বিচ্ছিন্ন।

পূর্ব্বপুরুষদের সহিতও তাহাদের জীবন্তযোগ নাই। কেবল পূর্ব্বাপর-প্রচলিত জড় প্রথাবন্ধনের দ্বারা যে যোগসাধন হয় তাহা যোগ নহে তাহা বন্ধন মাত্র। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যতীত পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত সচেতন মানসিক যোগ কখনই রক্ষিত হইতে পারে না।

আমাদের দেশের প্রাচীনকালের সহিত আধুনিককালের যদিও প্রথাগত বন্ধন আছে কিন্তু এক জায়গায় কোথায় আমাদের মধ্যে এমন একটা নাড়ীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে যে, সেকাল হইতে মানসিক প্রাণরস

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইয়া একাল পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতেছে না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেমন করিয়া চিন্তা করিতেন, কার্য্য করিতেন, নব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতেন; সমস্ত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কাব্যকলা ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজতন্ত্রের মর্ম্মস্থলে তাঁহাদের জীবৎশক্তি তাঁহাদের চিৎশক্তি জাগ্রত থাকিয়া কি ভাবে সমস্তকে সর্ব্বদা সৃজন এবং সংযমন করিত, কি ভাবে সমাজ প্রতিদিন বৃদ্ধি লাভ করিত পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইত, আপনাকে কেমন করিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিত, নূতন অবস্থাকে কেমন করিয়া আপনার সহিত সম্মিলিত করিত তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে জানি না। মহাভারতের কাল এবং আমাদের বর্ত্তমান কালের মাঝখানকার অপরিসীম বিচ্ছেদকে আমরা পূরণ করিব কি দিয়া? যখন ভুবনেশ্বর ও কণারক মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া যায়, তখন মনে হয় এই আশ্চর্য্য শিল্পকৌশলগুলি কি বাহিরের কোন আকস্মিক আন্দোলনে কতকগুলি প্রস্তরময় বুদ্‌বুদের মত হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল? সেই শিল্পীদের সহিত আমাদের যোগ কোন্‌খানে? যাহারা এত অনুরাগ, এত ধৈর্য্য, এত নৈপুণ্যের সহিত এই সকল অভ্রভেদী সৌন্দর্য্য সৃজন করিয়া তুলিয়াছিল—আর আমরা যাহারা অৰ্দ্ধনিমীলিত উদাসীন চক্ষে সেই সকল ভুবনমোহিনী কীর্ত্তির এক একটি প্রস্তরখণ্ড খসিতে দেখিতেছি অথচ কোনটা যথাস্থানে পুনস্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি না এবং পুনস্থাপন করিবার ক্ষমতাও রাখি না, আমাদের মাঝখানে এমন কি একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়াছিল যাহাতে পূর্ব্বকালের কার্য্যকলাপ এখনকার কালের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়—আমাদের জাতীয়-জীবন-ইতিহাসের মাঝখানের কয়েকখানি পাতা কে একেবারে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল যাহাতে আমরা তখনকার সহিত আপনাদিগের অর্থ মিলাইতে পারিতেছি না? এখন আমাদের নিকট বিধানগুলি রহিয়াছে কিন্তু সে বিধাতা নাই; শিল্পী নাই কিন্তু তাহাদের শিল্প-নৈপুণ্যে

দেশ আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আমরা যেন কোন্ এক পরিত্যক্ত রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে বাস করিতেছি—সেই রাজধানীর ইষ্টক যেখানে খসিয়াছে আমরা সেখানে কেবল কর্দ্দম এবং গোময়পঙ্ক লেপন করিয়াছি—পুরী নির্ম্মাণ করিবার রহস্য আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অবিদিত।

প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের সহিত আমাদের এতই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে যে, তাঁহাদের সহিত আমাদের পার্থক্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও আমরা হারাইয়াছি। আমরা মনে করি, সেকালের ভারতবর্ষের সহিত এখনকার কালের কেবল নূতন পুরাতনের প্রভেদ। সেকালে যাহা উজ্জ্বল ছিল, এখন তাহা মলিন হইয়াছে, সেকালে যাহা দৃঢ় ছিল এখন তাহাই শিথিল হইয়াছে—অর্থাৎ আমাদিগকেই যদি কেহ সোনার জল দিয়া, পালিশ করিয়া, কিঞ্চিৎ ঝক্‌ঝকে করিয়া দেয় তাহা হইলেই সেই অতীত ভারতবর্ষ সশরীরে ফিরিয়া আসে। আমরা মনে করি, প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহারা কেবল সজীব শাস্ত্রের শ্লোক ছিলেন—তাঁহারা কেবল বিশ্বজগৎকে মায়া মনে করিতেন এবং সমস্ত দিন জপতপ করিতেন। তাঁহারা যে যুদ্ধ করিতেন, রাজ্যরক্ষা করিতেন, শিল্প চর্চ্চা ও কাব্যালোচনা করিতেন, সমুদ্র পার হইয়া বাণিজ্য করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে যে ভাল মন্দের সংঘাত ছিল, বিচার ছিল, বিদ্রোহ ছিল, মতবৈচিত্র্য ছিল—এক কথায়, জীবন ছিল, তাহা আমরা জ্ঞানে জানি বটে কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি না। প্রাচীন ভারতবর্ষকে কল্পনা করিতে গেলেই নূতন পঞ্জিকার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সংক্রান্তির মূর্ত্তিটি আমাদের মনে উদয় হয়।

এই আত্যন্তিক ব্যবধানের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশে তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত সাহিত্যের মনোময় প্রাণময় ধারা অবিচ্ছেদে বহিয়া আসে নাই। সাহিত্যের যাহা কিছু আছে তাহা মাঝে মাঝে দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। তখনকার কালের চিন্তা-

স্রোত ভাবস্রোত প্রাণস্রোতের আদিগঙ্গা শুকাইয়া গেছে, কেবল তাহার নদীখাতের মধ্যে মধ্যে জল বাধিয়া আছে—তাহা কোন একটি বহমান আদিম ধারার দ্বারা পরিপুষ্ট নহে, তাহার কতখানি প্রাচীন জল কতটা আধুনিক লোকাচারের বৃষ্টিসঞ্চিত, বলা কঠিন। এখন আমরা সাহিত্যের ধারা অবলম্বন করিয়া হিন্দুত্বের সেই বৃহৎ প্রবল নানাভিমুখ সচল তটগঠনশীল সজীবস্রোত বাহিয়া একাল হইতে সেকালের মধ্যে যাইতে পারি না। এখন আমরা সেই শুষ্কপথের মাঝে মাঝে নিজের অভিরুচি ও আবশ্যক অনুসারে পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাকে হিন্দুত্ব নামে অভিহিত করিতেছি। সেই বদ্ধ ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন হিন্দুত্ব আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি; তাহার কোনটা বা আমার হিন্দুত্ব, কোনটা বা তোমার হিন্দুত্ব; তাহা সেই কণ্ব কণাদ, রাঘব কৌরব, নন্দ উপনন্দ এবং আমাদের সর্ব্বসাধারণের তরঙ্গিত প্রবাহিত অখণ্ডবিপুল হিন্দুত্ব কিনা সন্দেহ।

এইরূপে সাহিত্যের অভাবে আমাদের মধ্যে পূর্ব্বাপরের সজীব যোগ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। কিন্তু সাহিত্যের অভাব ঘটিবার একটা প্রধান কারণ, আমাদের মধ্যে জাতীয়-যোগবন্ধনের অসদ্ভাব। আমাদের দেশে কনোজ কোশল কাশী কাঞ্চী প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ভাবে আপন আপন পথে চলিয়া গিয়াছে, এবং মাঝে মাঝে অশ্বমেধের ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পরস্পরকে সংক্ষিপ্ত করিতেও ছাড়ে নাই। মহা-ভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ, রাজতরঙ্গিনীর কাশ্মীর, নন্দবংশীয়দের মগধ, বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, ইহাদের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের কোন ধারাবাহিক যোগ ছিল না। সেইজন্য সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের উপর জাতীয় সাহিত্য আপন অটল ভিত্তি স্থাপিত করিতে পারে নাই। বিচ্ছিন্ন দেশে বিচ্ছিন্নকালে গুণজ্ঞ রাজার আশ্রয়ে এক এক জন সাহিত্যকার আপন কীর্ত্তি স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

কালিদাস কেবল বিক্রমাদিত্যের, চাঁদবর্দ্দি কেবল পৃথ্বিরাজের, চাণক্য কেবল নন্দের। তাঁহারা তৎকালীন সমস্ত ভারতবর্ষের নহেন, এমন কি, তৎপ্রদেশেও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কোন যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের মধ্যে যখন সাহিত্য আপন উত্তপ্ত সুরক্ষিত নীড়টি বাঁধিয়া বসে তখনি সে আপনার বংশ রক্ষা করিতে, ধারাবাহিক-ভাবে আপনাকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিতে পারে। সেই জন্য প্রথমেই বলিয়াছি সহিতত্বই সাহিত্যের প্রধান উপাদান; সে বিচ্ছিন্নকে এক করে, এবং যেখানে ঐক্য সেইখানে আপন প্রতিষ্ঠাভূমি স্থাপন করে। যেখানে একের সহিত অন্যের, কালের সহিত কালান্তরের, গ্রামের সহিত ভিন্ন গ্রামের বিচ্ছেদ, সেখানে ব্যাপক সাহিত্য জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশে কিসে অনেক লোক এক হয়? ধর্ম্মে। সেই জন্য আমাদের দেশে কেবল ধর্ম্মসাহিত্যই আছে। সেই জন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল শাক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যেরই সমষ্টি। রাজপুত-গণকে বীরগৌরবে এক করিত, এই জন্য বীরগৌরব তাহাদের কবিদের গানের বিষয় ছিল।

আমাদের ক্ষুদ্র বঙ্গদেশেও একটা সাধারণ সাহিত্যের হাওয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মপ্রচার হইতেই ইহার আরম্ভ। প্রথমে যাঁহারা ইংরাজী শিখিতেন তাঁহারা প্রধানতঃ আমাদের বণিক্ ইংরাজ-রাজের নিকট উন্নতি লাভের প্রত্যাশাতেই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন; তাঁহাদের অর্থকরী বিদ্যা সাধারণের কোন কাজে লাগিত না। তখন সর্ব্বসাধারণকে এক শিক্ষায় গঠিত করিবার সঙ্কল্প কাহারও মাথায় উঠে নাই; তখন কৃতীপুরুষগণ যে যাহার আপন আপন পন্থা দেখিত।

বাংলার সর্ব্বসাধারণকে আপনাদের কথা শুনাইবার অভাব খৃষ্টীয় মিশনরিগণ সর্ব্বপ্রথমে অনুভব করেন—এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের

ভাষাকে শিক্ষা-বহনের ও জ্ঞানবিতরণের যোগ্য করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু এ কার্য্য বিদেশীয়ের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর নহে। নব্যবঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা রাজা রামমোহন রায়ই প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে গদ্যসাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন।

ইতিপূর্ব্বে আমাদের সাহিত্য কেবল পদ্যেই বদ্ধ ছিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে পদ্য যথেষ্ট ছিল না। কেবল ভাবের ভাষা, সৌন্দর্য্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা নহে; যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সর্ব্ববিষয়ের এবং সর্ব্বসাধারণের ভাষা তাঁহার আবশ্যক ছিল। পূর্ব্বে কেবল ভাবুকসভার জন্য পদ্য ছিল এখন জনসভার জন্য গদ্য অবতীর্ণ হইল। এই গদ্যপদ্যর সহযোগব্যতীত কখনও কোন সাহিত্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। খাস্ দরবার এবং আম্ দরবার ব্যতীত সাহিত্যের রাজদরবার সরস্বতী মহারাণীর সমস্ত প্রজাসাধারণের উপযোগী হয় না। রামমোহন রায় আসিয়া সরস্বতীর সেই আম্ দরবারের সিংহদ্বার স্বহস্তে উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন।

আমরা আশৈশবকাল গদ্য বলিয়া আসিতেছি কিন্তু গদ্য যে কি দুরূহ ব্যাপার, তাহা আমাদের প্রথম গদ্যকারদের রচনা দেখিলেই বুঝা যায়। পদ্যে প্রত্যেক ছত্রের প্রান্তে একটি করিয়া বিশ্রামের স্থান আছে, প্রত্যেক দুই ছত্র বা চারি ছত্রের পর একটা করিয়া নিয়মিত ভাবের ছেদ পাওয়া যায়; কিন্তু গদ্যে একটা পদের সহিত আর একটা পদকে বাঁধিয়া দিতে হয়, মাঝে ফাঁক রাখিবার জো নাই; পদের মধ্যে কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়াকে এবং পদগুলিকে পরস্পরের সহিত এমন করিয়া সাজাইতে হয় যাহাতে গদ্যপ্রবন্ধের আদ্যন্ত-মধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান হয়। ছন্দের একটা অনিবার্য্য প্রবাহ আছে; সেই প্রবাহের মাঝখানে একবার ফেলিয়া দিতে পারিলে কবিতা

সহজে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু গদ্যে নিজে পথ দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়া নিজের ভার সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়;—সেই পদব্রজ বিদ্যাটি রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চাল্ অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এলোমেলো এবং টল্‌মলে হইয়া থাকে। গদ্যের সুপ্রণালীবদ্ধ নিয়মটি আজকাল আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গেছে, কিন্তু অনধিককাল পূর্ব্বে এরূপ ছিল না।

তখন যে গদ্য রচনা করাই কঠিন ছিল তাহা নহে—তখন লোকে অনভ্যাসবশতঃ গদ্য প্রবন্ধ সহজে বুঝিতে পারিত না। দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল, তেমনি সর্ব্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল। আমি বোধ করি, কবিতায় হ্রস্ব পদ, ভাবের নিয়মিত ছেদ, ও ছন্দ এবং মিলের ঝঙ্কারবশতঃ কথাগুলি অতি শীঘ্র মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং শ্রোতাগণ তাহা সত্বর ধারণা করিতে পারে। কিন্তু ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায় গদ্যের প্রত্যেক পদটি এবং পদের প্রত্যেক অংশটি পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে বিশেষ একটা মানসিক চেষ্টার আবশ্যক করে। সেই জন্য রামমোহন রায় যখন বেদান্তসূত্র বাংলায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন, গদ্য বুঝিবার কি প্রণালী, তৎসম্বন্ধে ভূমিকা রচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। সেই অংশটি উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

"......এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না, ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়।" অতঃপর কি করিলে গদ্যে বোধ জন্মে তৎসম্বন্ধে লেখক উপদেশ দিতেছেন।—"বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুয়ের বিবেচনা বিশেষ

মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন" ইত্যাদি।

পুরাণ ইতিহাসে পড়া গিয়াছে, রাজগণ সহসা কোন ঋষির তপোবনে অতিথি হইলে তাঁহারা যোগবলে মদ্যমাংসের সৃষ্টি করিয়া রাজা ও রাজানুচরবর্গকে ভোজন করাইতেন। বেশ দেখা যাইতেছে তপোবনেব নিকট দোকানবাজারের সংস্রব ছিল না, এবং শালপত্রপুটে কেবল হরীতকী আমলকী সংগ্রহ করিয়া রাজযোগ্য ভোজের আয়োজন করা যায় না—সেই জন্য ঋষিদিগকে তপঃপ্রভাব প্রয়োগ করিতে হইত। রামমোহন রায় যেখানে ছিলেন সেখানেও কিছুই প্রস্তুত ছিল না; গদ্য ছিল না, গদ্যবোধশক্তিও ছিল না,—যে সময়ে এ কথা উপদেশ করিতে হইত, যে, প্রথমের সহিত শেষের যোগ, কর্ত্তার সহিত ক্রিয়ার অন্বয় অনুসরণ করিয়া গদ্য পাঠ কবিতে হয়, সেই আদিমকালে রামমোহন পাঠকদেব জন্য কি উপহার প্রস্তুত করিতেছিলেন? বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ। তিনি সর্ব্বসাধারণকে অযোগ্যজ্ঞান করিয়া তাহাদের হস্তে উপস্থিতমত সহজপ্রাপ্য আমলকী হরীতকী আনিয়া দিলেন না। সর্ব্বসাধারণেব প্রতি তাঁহার এমন একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আমাদের দেশে অধুনাতন কালের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথমে মানবসাধারণকে রাজা বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিয়াছেন, সাধারণ নামক এই মহারাজকে আমি যথোচিত অতিথি সৎকার করিব—আমার অরণ্যে ইঁহার উপযুক্ত কিছুই নাই কিন্তু আমি কঠিন তপস্যার দ্বারা রাজভোগের সৃষ্টি করিয়া দিব।

কেবল পণ্ডিতদের নিকট পাণ্ডিত্য করা, জ্ঞানীদের নিকট খ্যাতি অর্জ্জন করা, রামমোহন রায়ের ন্যায় পরম বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যের নির্জ্জন অত্যুচ্চশিখর ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের সুধা সমস্ত মানবসভার মধ্যে পরিবেষণ করিতে উদ্যত হইলেন।

এইরূপে বাংলাদেশে এক নূতন রাজার রাজত্ব, এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল। নব্যবঙ্গের প্রথম বাঙালী, সর্ব্বসাধারণকে রাজটীকা পরাইয়া দিলেন—এবং এই রাজার বাসের জন্য সমস্ত বাংলা দেশে বিস্তীর্ণ ভূমির মধ্যে সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কালে কালে সেই ভিত্তির উপর নব নব তল নির্ম্মিত হইয়া সাহিত্যহর্ম্ম্য অভ্রভেদী হইয়া উঠিবে এবং অতীত ভবিষ্যতের সমস্ত বঙ্গহৃদয়কে স্থায়ী আশ্রয় দান করিতে থাকিবে অদ্য আমাদের নিকট ইহা দুরাশার স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে বড় একটি উন্নত ভাবের উপর বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন এই নির্ম্মাণকার্য্যের আরম্ভ হয় তখন বঙ্গভাষার না ছিল কোন যোগ্যতা, না ছিল সমাদর; তখন বঙ্গভাষা কাহাকে খ্যাতিও দিত না অর্থও দিত না; তখন বঙ্গভাষায় ভাব প্রকাশ করাও দুরূহ ছিল এবং ভাব প্রকাশ করিয়া তাহা সাধারণের মধ্যে প্রচার করাও দুঃসাধ্য ছিল। তাহার আশ্রয়দাতা রাজা ছিল না, তাহার উৎসাহদাতা শিক্ষিতসাধারণ ছিল না। যাঁহারা ইংরাজি চর্চ্চা করিতেন তাঁহারা বাংলাকে উপেক্ষা করিতেন এবং যাঁহারা বাংলা জানিতেন তাঁহারাও এই নূতন উদ্যমের কোন মর্য্যাদা বুঝিতেন না।

তখন বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্মুখে কেবল সুদূর ভবিষ্যৎ এবং সুবৃহৎ জনমণ্ডলী উপস্থিত ছিল—তাহাই যথার্থ সাহিত্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি; স্বার্থও নহে খ্যাতিও নহে, প্রকৃত সাহিত্যের ধ্রুব লক্ষ্যস্থল কেবল

নিরবধিকাল এবং বিপুলা পৃথিবী। সেই লক্ষ্য থাকে বলিয়াই সাহিত্য মানবের সহিত মানবকে, যুগের সহিত যুগান্তরকে প্রাণবন্ধনে বাঁধিয়া দেয়। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও ব্যাপ্তিসহকারে কেবল যে সমস্ত বাঙালীর হৃদয় অন্তরতম যোগে বদ্ধ হইবে তাহা নহে,—এক সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিকেও বঙ্গসাহিত্য আপন জ্ঞানান্ন বিতরণের অতিথিশালায়, আপন ভাবামৃতের অবারিত সদাব্রতে আকর্ষণ করিয়া আনিবে তাহার লক্ষণ এখন হইতেই অল্পে অল্পে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা একক ভাবেই কাজ করিয়াছেন। এককভাবে সকল কাজই কঠিন, বিশেষত সাহিত্যের কাজ। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান সহিতত্ব। যে সমাজে জনসাধারণের মনের মধ্যে অনেকগুলি ভাব সঞ্চিত এবং সর্ব্বদা আন্দোলিত হইতেছে, যেখানে পরস্পরের মানসিক সংস্পর্শ নানা আকারে পরস্পর অনুভব করিতে পারিতেছে,—সেখানে সেই মনের সংঘাতে ভাব এবং ভাবের সংঘাতে সাহিত্য স্বতই জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে। এই মানবমনের সজীব সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবলমাত্র দৃঢ় সঙ্কল্পের আঘাতে সঙ্গীহীন মনকে জনশূন্য কঠিন কর্ত্তব্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চালনা করা, একলা বসিয়া চিন্তা করা, উদাসীনদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার একান্ত চেষ্টা করা, সুদীর্ঘকাল একমাত্র নিজের অনুরাগের উত্তাপে নিজের ভাবপুষ্পগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস করা এবং চিরজীবনের প্রাণপণ উদ্যমের সফলতা সম্বন্ধে চিরকাল সন্দিহান হইয়া থাকা—এমন নিরানন্দের অবস্থা আর কি আছে? যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে কেবল যে তাহারই কষ্ট তাহা নয়, ইহাতে কাজেরও অসম্পূর্ণতা ঘটে। এইরূপ উপবাসদশায় সাহিত্যের ফুলগুলিতে সম্পূর্ণ রং ধরে না, তাহার ফলগুলিতে পরিপূর্ণমাত্রায় পাক ধরিতে পায় না।

সাহিত্যের সমস্ত আলোক ও উত্তাপ সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে না।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন পৃথিবীবেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলের একটি প্রধান কাজ, সূর্য্যালোককে ভাঙিয়া বণ্টন করিয়া চারিদিকে যথাসম্ভব সমান-ভাবে বিকীর্ণ করিয়া দেওয়া। বাতাস না থাকিলে মধ্যাহ্ন কালেও কোথাও বা প্রখর আলোক কোথাও বা নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করিত।

আমাদের জ্ঞানরাজ্যের মনোরাজ্যের চারিদিকেও সেইরূপ একটা বায়ুমণ্ডলের আবশ্যকতা আছে। সমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া এমন একটা অনুশীলনের হাওয়া বহা চাই যাহাতে জ্ঞান এবং ভাবের রশ্মি চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত বিকীর্ণ হইতে পারে।

যখন বঙ্গদেশে প্রথম ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হয়, যখন আমাদের সমাজে সেই মানসিক বায়ুমণ্ডল সৃজিত হয় নাই তখন সতরঞ্চের শাদা এবং কালো ঘরের মত শিক্ষা এবং অশিক্ষা পরস্পর সংলিপ্ত না হইয়া ঠিক পাশাপাশি বাস করিত। যাহারা ইংরাজি শিখিয়াছে এবং যাহারা শেখে নাই তাহারা সুস্পষ্টরূপে বিভক্ত ছিল—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সংযোগ ছিল না, কেবল সংঘাত ছিল। শিক্ষিত ভাই আপন অশিক্ষিত ভাইকে মনের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিত কিন্তু কোন সহজ উপায়ে তাহাকে আপন শিক্ষার অংশ দান করিতে পারিত না।

কিন্তু দানের অধিকার না থাকিলে কোন জিনিষে পুরা অধিকার থাকে না। কেবল ভোগস্বত্ব এবং জীবনস্বত্ব নাবালক এবং স্ত্রীলোকের অসম্পূর্ণ অধিকার মাত্র। এক সময়ে আমাদের ইংরাজি পণ্ডিতেরা মস্ত পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাহাদের পাণ্ডিত্য তাঁহাদের নিজের মধ্যেই বদ্ধ থাকিত, দেশের লোককে দান করিতে পারিতেন না—এই জন্য সে পাণ্ডিত্য কেবল বিরোধ এবং অশান্তির সৃষ্টি করিত। সেই অসম্পূর্ণ

পাণ্ডিত্যে কেবল প্রচুর উত্তাপ দিত কিন্তু যথেষ্ট আলোক দিত না।

এই ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ ব্যাপ্তিহীন পাণ্ডিত্য কিছু অত্যুগ্র হইয়া উঠে; কেবল তাহাই নহে, তাহার প্রধান দোষ এই, যে, নবশিক্ষার মুখ্য এবং গৌণ অংশ সে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে না। সেই জন্য প্রথম প্রথম যাঁহারা ইংরাজি শিখিয়াছিলেন তাঁহারা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীদের প্রতি অনাবশ্যক উৎপীড়ন করিয়াছিলেন এবং স্থির করিয়াছিলেন মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ।

চালের বস্তার চাল এবং কাঁকর পৃথক্ বাছিতে হইলে একটা পাত্রে সমস্ত ছড়াইয়া ফেলিতে হয়—তেমনি নবশিক্ষা অনেকের মধ্যে বিস্তারিত করিয়া না দিলে তাহার শস্য এবং কঙ্কর অংশ নির্ব্বাচন করিয়া ফেলা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। অতএব প্রথম প্রথম যখন নূতন শিক্ষায় সম্পূর্ণ ভাল ফল না দিয়া নানা প্রকার অসঙ্গত আতিশয্যের সৃষ্টি করে তখন অতিমাত্র ভীত হইয়া সে শিক্ষাকে রোধ করিবার চেষ্টা সকল সময়ে সদ্বিবেচনার কাজ নহে। যাহা স্বাধীনভাবে ব্যাপ্ত হইতে পারে তাহা আপনাকে আপনি সংশোধন করিয়া লয়, যাহা বদ্ধ থাকে তাহাই দূষিত হইয়া উঠে।

এই কারণে, ইংরাজি শিক্ষা যখন সঙ্কীর্ণ সীমায় নিরুদ্ধ ছিল তখন সেই ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে ইংরাজি সভ্যতার ত্যাজ্য অংশ সঞ্চিত হইয়া সমস্ত কলুষিত করিয়া তুলিতেছিল। এখন সেই শিক্ষা চারিদিকে বিস্তৃত হওয়াতেই তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা যে ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত হইয়াছে তাহা নহে। বাংলা সাহিত্যই তাহার প্রধান সহায় হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালী এক সময়ে ইংরাজ রাজ্য স্থাপনের সহায়তা করিয়াছিল—ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গসাহিত্য আজ ইংরাজি ভাবরাজ্য

এবং জ্ঞানরাজ্য বিস্তারের প্রধান সহকারী হইয়াছে। এই বাংলা সাহিত্য-যোগে ইংরাজিভাব যখন ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র সুগম হইল তখনই ইংরাজি সভ্যতার অন্ধ দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্য আমরা সচেতন হইয়া উঠিলাম। ইংরাজি শিক্ষা এখন আমাদের সমাজে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে এই জন্য আমরা স্বাধীনভাবে তাহার ভাল মন্দ তাহার মুখ্য গৌণ বিচারের অধিকারী হইয়াছি; এখন নানা চিত্ত নানা অবস্থায় তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে; এখন সেই শিক্ষার দ্বারা বাঙালীর মন সজীব হইয়াছে এবং বাঙালীর মনকে আশ্রয় করিয়া সেই শিক্ষাও সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের জ্ঞানরাজ্যের চতুর্দ্দিকে মানসিক বায়ুমণ্ডল এমনি করিয়া সৃজিত হয়। আমাদের মন যখন সজীব ছিল না তখন এই বায়ুমণ্ডলের অভাব আমরা তেমন করিয়া অনুভব করিতাম না, এখন আমাদের মানসপ্রাণ যতই সজীব হইয়া উঠিতেছে ততই এই বায়ুমণ্ডলের জন্য আমরা ব্যাকুল হইতেছি।

এতদিন আমাদিগকে জলমগ্ন ডুবারীর মত ইংরাজি সাহিত্যাকাশ হইতে নলে করিয়া হাওয়া আনাইতে হইত। এখনো সে নল সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু অল্পে অল্পে আমাদের জীবনসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারিদিকে সেই বায়ুসঞ্চারও আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশীয় ভাষার দেশীয় সাহিত্যের হাওয়া উঠিয়াছে।

যতক্ষণ বাংলা দেশে সাহিত্যের সেই হাওয়া বহে নাই, সেই আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই; যতক্ষণ বঙ্গসাহিত্য এক একটি স্বতন্ত্র সঙ্গীহীন প্রতিভাশিখর আশ্রয় করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, ততক্ষণ তাহার দাবী করিবার বিষয় বেশি কিছু ছিল না। ততক্ষণ কেবল বলবান্ ব্যক্তিগণ তাহাকে নিজ বীর্য্যবলে নিজ বাহুযুগলের উপর ধারণ-পূর্ব্বক পালন করিয়া আসিতেছিলেন। এখন সে সাধারণের হৃদয়ের

মধ্যে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করিয়াছে এখন বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই সে অবাধ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন অন্তঃপুরেও সে পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় প্রবেশ করে এবং বিদ্বৎসভাতেও সে সমাদৃত অতিথির ন্যায় আসন প্রাপ্ত হয়। এখন যাঁহারা ইংরাজিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করাকে গৌরব জ্ঞান করেন; এখন অতিবড় বিলাতী-বিদ্যাভিমানীও বাংলা পাঠকদিগের নিকট খ্যাতি অর্জ্জন করাকে আপন চেষ্টার অযোগ্য বোধ করেন না।

প্রথমে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবাহ আমাদের সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন কেবল বিলাতী বিদ্যার একটা বালীর চর বাঁধিয়া দিয়াছিল;--সে বালুকারাশি পরস্পর অসংসক্ত, তাহার উপরে না আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করা যায়, না তাহা সাধারণের প্রাণ-ধারণযোগ্য শস্য উৎপাদন করিতে পারে। অবশেষে তাহারই উপরে যখন বঙ্গসাহিত্যের পলিমৃত্তিকা পড়িল তখন যে কেবল দৃঢ় তট বাঁধিয়া গেল, তখন যে কেবল বাংলার বিচ্ছিন্ন মানবেরা এক হইবার উপক্রম করিল তাহা নহে, তখন বাংলা-হৃদয়ের চিরকালের খাদ্য এবং আশ্রয়ের উপায় হইল। এখন এই জীবনশালিনী জীবনদায়িনী মাতৃভাষা সন্তান-সমাজে আপন অধিকার প্রার্থনা করিতেছে।

সেই জন্যই আজ উপযুক্ত কালে এক সময়োচিত আন্দোলন স্বতই উদ্ভূত হইয়াছে। কথা উঠিয়াছে, আমাদের বিদ্যালয়ে অধিকতর পরিমাণে বাংলা শিক্ষা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

কেন আবশ্যক? কারণ, শিক্ষা দ্বারা আমাদের হৃদয়ের যে আকাঙ্ক্ষা যে অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে বাংলা ভাষা ব্যতীত তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। শিখিয়া যদি কেবল সাহেবের চাকুরি ও আপিসের কেরাণীগিরি করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু শিক্ষায় আমাদের মনে

যে কর্ত্তব্যের আদর্শ স্থাপিত করিয়াছে তাহা লোকহিত। জনসাধারণের নিকটে আপনাকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ করিতে হইবে, সকলকে শিক্ষা বিতরণ করিতে হইবে, সকলকে ভাবরসে সরস করিতে হইবে, সকলকে জাতীয় বন্ধনে যুক্ত করিতে হইবে।

দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের অবলম্বন ব্যতীত এ কার্য্য কখনই সিদ্ধ হইবার নহে। আমরা পরের হস্ত হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছি দান করিবার সময় নিজের হস্ত দিয়া তাহা বণ্টন করিতে হইবে।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে, সর্ব্বসাধারণের নিকট নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবার, যাহা লাভ করিয়াছি তাহা সাধারণের জন্য সঞ্চয় করিবার, যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহা সাধারণের সমক্ষে প্রমাণ করিবার, যাহা ভোগ করিতেছি তাহা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অদৃষ্টদোষে সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার উপায় এখনও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সুলভ হয় নাই। আমরা ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে উদ্দেশ্য শিক্ষা করিতেছি কিন্তু উপায় লাভ করিতেছি না।

কেহ কেহ বলেন বিদ্যালয়ে বাংলা প্রচলনের কোন আবশ্যক নাই; কারণ, এ পর্য্যন্ত ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজের অনুরাগেই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাংলা শিখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অতিমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন কেবল ক্ষমতাশালী লেখকের উপর বাংলা সাহিত্য নির্ভর করিতেছে না, এখন তাহা সমস্ত শিক্ষিতসাধারণের সামগ্রী। এখন প্রায় কোন-না-কোন উপলক্ষে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই উপর সমাজের দাবী দেখা যায়। কিন্তু সকলের শক্তি সমান নহে; অশিক্ষা ও অনভ্যাসের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার কর্ত্তব্য

পালন সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। এবং বাংলা অপেক্ষাকৃত অপরিণত ভাষা বলিয়াই তাহাকে কাজে লাগাইতে হইলে সবিশেষ শিক্ষা এবং নৈপুণ্যের আবশ্যক করে।

এখন বাংলা খবরের কাগজ, মাসিক পত্র, সভাসমিতি, আত্মীয়সমাজ সর্ব্বত্র হইতেই বঙ্গভূমি তাহার শিক্ষিত সন্তানদিগকে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে আহ্বান করিতেছে। যাহারা প্রস্তুত নহে যাহারা অক্ষম, তাহারা কিছু-না-কিছু সঙ্কোচ অনুভব করিতেছে। অসাধারণ নির্লজ্জ না হইলে আজ কাল বাংলা ভাষার অজ্ঞতা লইয়া আস্ফালন করিতে কেহ সাহস করে না। এক্ষণে আমাদের বিদ্যালয় যদি ছাত্রদিগকে আমাদের বর্ত্তমান আদর্শের উপযোগী না করিয়া তোলে, আমাদের সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতসাধনে সক্ষম না করে, যে বিদ্যা আমাদিগকে অর্পণ করে সঙ্গে সঙ্গে তাহার দানাধিকার যদি আমাদিগকে না দেয়, আমাদের পরমাত্মীয়দিগকে বুভুক্ষিত দেখিয়াও সে বিদ্যা পরিবেষন করিবার শক্তি যদি আমাদের না থাকে—তবে এমন বিদ্যালয় আমাদের বর্ত্তমানকাল ও অবস্থার পক্ষে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

যেমন মাছ ধরিবার সময় দেখা যায়, অনেক মাছ যতক্ষণ বঁড়শিতে বিদ্ধ হইয়া জলে খেলাইতে থাকে ততক্ষণ তাহাকে ভারিমস্ত মনে হয়, কিন্তু ডাঙায় টান মারিয়া তুলিলেই প্রকাশ হইয়া পড়ে যত বড়টা মনে করিয়াছিলাম তত বড়টা নহে; যেমন রচনাকালে দেখা যায় একটা ভাব যতক্ষণ মনের মধ্যে অস্ফুট অপরিণত আকারে থাকে ততক্ষণ সেটাকে অত্যন্ত বিপুল এবং নূতন মনে হয় কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলেই তাহা দুটো কথায় শেষ হইয়া যায় এবং তাহার নূতনত্বের উজ্জ্বলতাও দেখিতে পাওয়া যায় না—যেমন স্বপ্নে অনেক ব্যাপারকে অপরিসীম বিস্ময়জনক এবং বৃহৎ মনে হয় কিন্তু জাগরণমাত্রেই তাহা তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে তেমনি

পরের শিক্ষাকে যতক্ষণ নিজের ডাঙায় না টানিয়া তোলা যায় ততক্ষণ আমরা বুঝিতেই পারি না বাস্তবিক কতখানি আমরা পাইয়াছি। আমাদের অধিকাংশ বিদ্যাই বঁড়শিগাঁথা মাছের মত ইংরাজি ভাষার সুগভীর সরোবরের মধ্যে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, আন্দাজে তাহার গুরুত্ব নির্ণয় করিয়া খুব পুলকিত গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছি। যদি বঙ্গ-ভাষার কূলে একবার টানিয়া তুলিতে পারিতাম তাহা হইলে সম্ভবত নিজের বিদ্যাটাকে তত বেশি বড় না দেখাইতেও পারিত; নাই দেখাক্, তবু সেটা ভোগে লাগিত এবং আয়তনে ছোট হইলেও আমাদের কল্যাণরূপিণী গৃহলক্ষ্মীর স্বহস্তকৃত রন্ধনে, অমিশ্র অনুরাগ এবং বিশুদ্ধ শর্ষপ তৈল সহযোগে পরম উপাদেয় হইতে পারিত।

বাইবেলে কথিত আছে, যাহার নিজের কিছু আছে তাহাকেই দেওয়া হইয়া থাকে। যে লোক একেবারে রিক্ত তাহার পক্ষে কিছু গ্রহণ করা বড় কঠিন। জলাশয়েই বৃষ্টির জল বাধিয়া থাকে, শুষ্ক মরু-ভূমে তাহা দাঁড়াইবে কোথায়? আমরা নূতন বিদ্যাকে গ্রহণ করিব সঞ্চিত করিব কোন্‌খানে? যদি নিজের শুষ্ক স্বার্থ এবং ক্ষণিক আবশ্যক ও ভোগের মধ্যে সে প্রতিক্ষণে শোষিত হইয়া যায় তবে সে শিক্ষা কেমন করিয়া ক্রমশঃ স্থায়িত্ব ও গভীরতা লাভ করিবে, সরস্বতীর সৌন্দর্য্যশতদলে প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে, আপনার তটভূমিকে স্নিগ্ধ শ্যামল, আকাশকে প্রতিফলিত, বহুকাল ও বহুলোককে আনন্দে ও নির্ম্মলতায় অভিষিক্ত করিয়া তুলিবে?

বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে আরও একটি কথা বলিবার আছে। আলো-চনা ব্যতীত কোন শিক্ষা সজীবভাবে আপনার হয় না। নানা মানব মনের মধ্য দিয়া গড়াইয়া না আসিলে একটা শিক্ষার বিষয় মানব-সাধারণের যথার্থ ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠে না। যে দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে সে দেশে বিজ্ঞান অন্তরে

বাহিরে আচারে ব্যবহারে ভাষায় ভাবে সর্ব্বত্র সংলিপ্ত হইয়া গেছে। সে দেশে বিজ্ঞান একটা অপরিচিত শুষ্ক জ্ঞান নহে, তাহা মানবমনের সহিত মানবজীবনের সহিত সজীবভাবে নানা আকারে মিশ্রিত হইয়া আছে। এই জন্য সে দেশে অতি সহজেই বিজ্ঞানের অনুরাগ অকৃত্রিম হয়, বিজ্ঞানের ধারণা গভীরতর হইয়া থাকে। নানা মনের মধ্যে অবিশ্রাম সঞ্চরিত হইয়া সেখানে বিজ্ঞান প্রাণ পাইয়া উঠে। যে দেশে সাহিত্য চর্চ্চা প্রাচীন ও পরিব্যাপ্ত সে দেশে সাহিত্য কেবল গুটিকতক লোকের সখের মধ্যে বদ্ধ নহে। তাহা সমাজের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত প্রবাহিত, তাহা দিনে নিশীথে মনুষ্যজীবনের সহিত নানা আকারে মিশ্রিত হইয়াছে এই জন্য সাহিত্যানুরাগ সেখানে সহজ, সাহিত্যবোধ স্বাভাবিক। আমাদের দেশে বিদ্বান্ লোকদের মধ্যে বিদ্যার আলোচনা যথেষ্ট নাই এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকালের পূর্ব্বে অতি যৎ-সামান্যই ছিল।

কারণ, দেশীয় সাহিত্যের সম্যক্ বিস্তার অভাবে অনেকের মধ্যে কোন বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব, এবং আলোচনা অভাবে বিদ্বান্ ব্যক্তি-গণ চতুর্দ্দিক্ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল নিজের মধ্যেই বদ্ধ। তাঁহাদের জ্ঞানবৃক্ষ চারিদিকের মানব মন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জীবনরস আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাস্যলেশহীন একটা সুগভীর নিরানন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত অভাব তাহার অন্যতম কারণ। কি করিয়া কালযাপন করিতে হইবে আমরা ভাবিয়া পাই না। আমরা সকালবেলায় চুপ করিয়া দ্বারের কাছে বসিয়া তামাক খাই, দ্বিপ্রহরে আপিসে যাই, সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া তাস খেলি। সমাজের মধ্যে এমন একটা সর্ব্বব্যাপী প্রবাহ নাই যাহাতে আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখে, যাহাতে আমাদিগকে এক সঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। আমরা

যে যার আপন আপন ঘরে উঠিতেছি বসিতেছি গড়াইতেছি এবং যথা-কালে—অধিকাংশতই অকালে—মরিতেছি। ইহার প্রধান কারণ, আমরা বিচ্ছিন্ন। আমাদের শিক্ষার সহিত সমাজের, আদর্শের সহিত চরিত্রের, ভাবের সহিত কার্য্যের, আপনার সহিত চতুর্দ্দিকের সর্ব্বাঙ্গীণ মিশ খায় নাই। আমরা বীরত্বের ইতিহাস জানি কিন্তু বীর্য্য কাহাকে বলে জানি না, আমরা সৌন্দর্য্যের সমালোচনা অনেক পড়িয়াছি কিন্তু চতুর্দ্দিকে সৌন্দর্য্য রচনা করিবার কোন ক্ষমতা নাই; আমরা অনেক ভাব অনুভব করিতেছি কিন্তু অনেকের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিব এমন লোক পাইতেছি না। এই সকল মনোরুদ্ধ ভাব সকল ক্রমশ বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহা ক্রমে অলীক আকার ধারণ করে। অন্যদেশে যাহা একান্ত সত্য আমাদের দেশে তাহা অন্তঃসার-শূন্য হাস্যকর আতিশয্যে পরিণত হইয়া উঠে।

হিমালয়ের মাথার উপরে যদি উত্তরোত্তর কেবলি বরফ জমিতে থাকিত তবে ক্রমে তাহা অতি বিপর্য্যয় অদ্ভুত এবং পতনোন্মুখ উচ্চতা লাভ করিত এবং তাহা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় হইত—কিন্তু সেই বরফ নির্ঝররূপে গলিয়া প্রবাহিত হইলে হিমালয়েরও অনাবশ্যক ভার লাঘব হয় এবং সেই সজীব ধারায় সুদূরপ্রসারিত তৃষাতুর ভূমি সরস শস্যশালী হইয়া উঠে—ইংরাজি বিদ্যা যতক্ষণ বদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহা সেই জড় নিশ্চল বরফভারের মত—দেশীয় সাহিত্যযোগে তাহা বিগলিত প্রবাহিত হইলে তবে সেই বিদ্যারও সার্থকতা হয়, বাঙালীর ছেলের মাথারও ঠিক থাকে এবং স্বদেশের তৃষাও নিবারিত হয়। অবরুদ্ধ ভাবগুলি অনেকের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়া তাহার আতিশয্যবিকার দূর হইতে থাকে। যে সকল ইংরাজি ভাব যথার্থরূপে আমাদের দেশের লোক গ্রহণ করিতে পারে—অর্থাৎ যাহা বিশেষরূপে ইংরাজি নহে, যাহা সার্ব্বভৌমিক,—তাহাই থাকিয়া যায় এবং বাকি সমস্ত নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের

মধ্যে একটা মানসিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়—সাধারণের মধ্যে একটা আদর্শের এবং আনন্দের ঐক্য জাগিয়া উঠে, বিদ্যার পরীক্ষা হয়, ভাবের আদান প্রদান চলে; ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে যাহা শেখে বাড়িতে আসিয়া তাহার অনুবৃত্তি দেখিতে পায়, এবং বয়স্কসমাজে প্রবেশ করিবার সময় বিদ্যাভারকে বিদ্যালয়ের বহির্দ্বারে ফেলিয়া আসা আবশ্যক হয় না। এই যে স্কুলের সহিত গৃহের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, ছাত্রবয়সের সহিত কর্ম্মকালের সম্পূর্ণ ব্যবধান, নিজের সহিত আত্মীয়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন শিক্ষা, এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা দূর হইয়া যায়; দেশীয় সাহিত্যের সংযোজনীশক্তি প্রভাবে বাঙালী আপনার মধ্যে আপনি ঐক্যলাভ করে—তাহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হইতে পারে তাহার জীবনও সফলতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এখনো আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা বাঙালি ছাত্রদিগকে অধিকতর পরিমাণে বাংলা শিখাইবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না—এমন কি, সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। যদি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, যে, আমরা যেদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই দেশের ভাষায় আমাদের নবলব্ধ জ্ঞান বিস্তার করিবার, আমাদের নবজাত ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের সকলেরই আয়ত্ত থাকা উচিত কি না—তাঁহারা উত্তর দেন—উচিত; কিন্তু তাঁহাদের মতে, সে জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হইবার আবশ্যকতা নাই; তাঁহারা বলেন ইচ্ছা করিলেই বাঙালীর ছেলেমাত্রই বাংলা শিখিতে ও লিখিতে পারে।

কিন্তু ইচ্ছা জন্মিবে কেন? সকলেই জানেন, পরিচয়ের পর যে সকল বিষয়ের প্রতি আমাদের পরম অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, পরিচয় হইবার পূর্ব্বে তাহাদের প্রতি অনেক সময় আমাদের বৈমুখ্যভাব অসম্ভব নহে। অনুরাগ জন্মিবার একটা অবসর দেওয়াও কর্ত্তব্য;—এবং পূর্ব্ব হইতে

পথকে কিয়ৎপরিমাণেও সুগম করিয়া রাখিলে কর্ত্তব্যবুদ্ধি সহজেই তদভিমুখে ধাবিত হইতে পারে। সম্মুখে একেবারে অনভ্যস্ত পথ দেখিলে কর্ত্তব্য-ইচ্ছা স্বভাবতই উদ্বোধিত হইতে চাহে না।

কিন্তু, বৃথা এ সকল যুক্তি প্রয়োগ করা! আমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক আছেন বাংলার প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ, রুচি এবং শ্রদ্ধা নাই; তাঁহাদিগকে যেমন করিয়া যে দিকে ফিরান যায় তাঁহাদের কম্পা-সের কাঁটা ইংরাজির দিকেই ঘুরিয়া বসে। তাঁহারা অনেকে ইংরাজি আহার এবং পরিচ্ছদকে বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণা করেন;—তাঁহারা আমাদের জাতির বাহ্য শরীরকে বিলাতী অশন বসনের সহিত সংসক্ত দেখিতে চাহেন না;—কিন্তু সমস্ত জাতির মনঃশরীরকে বিদেশীয় ভাষার পরিচ্ছদে মণ্ডিত এবং বিজাতীয় সাহিত্যের আহার্য্যে পরিবর্দ্ধিত দেখিতে তাঁহাদের আক্ষেপ বোধ হয় না। শরীরের সহিত বস্ত্র তেমন করিয়া সংলিপ্ত হয় না, মনের সহিত ভাষা যেমন করিয়া জড়িত হইয়া যায়। যাঁহারা আপন সন্তানকে তাহার মাতৃভাষা শিখিবার অবসর দেন না, যাঁহারা পরমাত্মীয়দিগকেও ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখিতে লজ্জা বোধ করেন না, যাঁহারা "পদ্মবনে মত্তকরীসম" বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরাজির ফোঁটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন, যাঁহাদিগকে বাংলায় হস্তীমূর্খ বলিলে অবিচলিত থাকেন কিন্তু ইংরা-জিতে ইগ্নোরেণ্ট্ বলিলে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে এ কথা বুঝান কঠিন, যে, তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার সন্তোষজনক পরিণাম নহেন।

কিন্তু ইংরাজি-অভিমানী, মাতৃভাষাদ্বেষী বাঙালীর ছেলেকে আমরা দোষ দিতে চাহি না। ইংরাজির প্রতি এই উৎকট পক্ষপাত স্বাভাবিক। কারণ, ইংরাজি ভাষাটা একে রাজার ঘরের মেয়ে, তাহাতে আবার তিনি আমাদের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার—তাঁহার আদর যে অত্যন্ত বেশি হইবে

তাহাতে বিচিত্র নাই। তাঁহার যেমন রূপ তেমনি ঐশ্বর্য্য—আবার তাঁহার সম্পর্কে আমাদের রাজপুত্রদের ঘরেও আমরা কিঞ্চিৎ সম্মানের প্রত্যাশা রাখি। সকলেই অবগত আছেন ইহাঁর প্রসাদে উক্ত যুবরাজদের প্রাসাদদ্বারপ্রান্তে আমরা কখন কখন স্থান পাইয়া থাকি; আবার কখন কখন কর্ণপীড়নও লাভ হয়—সেটাকে আমরা পরিহাসের স্বরূপ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি কিন্তু চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পড়ে।

আর আমাদের হতভাগিনী প্রথম পক্ষটি—আমাদের দরিদ্র বাংলা ভাষা—পাকশালার কাজ করেন—সে কাজটি নিতান্ত সামান্য নহে, তেমন আবশ্যক কাজ আর আমাদের আছে কি না সন্দেহ, কিন্তু তাঁহাকে আমাদের আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে। পাছে তাঁহার মলিন বসন লইয়া তিনি আমাদের ধনশালী নব কুটুম্বদের চক্ষে পড়েন এই জন্য তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখি;—প্রশ্ন করিলে বলি—চিনি না!

সে দরিদ্র ঘরের মেয়ে। তাহার বাপের রাজত্ব নাই। সে সম্মান দিতে পারে না, সে কেবলমাত্র ভালবাসা দিতে পারে। তাহাকে যে ভালবাসে তাহার পদবৃদ্ধি হয় না, তাহার বেতনের আশা থাকে না, রাজদ্বারে তাহার কোন পরিচয় প্রতিপত্তি নাই। কেবল যে অনাথাকে সে ভালবাসে সেই তাহাকে গোপনে ভালবাসার পূর্ণ প্রতিদান দেয়। এবং সেই ভালবাসার যথার্থ স্বাদ যে পাইয়াছে সে জানে, যে, পদমান প্রতিপত্তি এই প্রেমের নিকট তুচ্ছ।

রূপকথায় যেমন শুনা যায় এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ দেখিতেছি—আমাদের ঘরের এই নূতন রাণী সুয়া রাণী নিষ্ফল, বন্ধ্যা। এতকাল এত যত্নে এত সম্মানে সে মহিষী হইয়া আছে কিন্তু তাহার গর্ভে আমাদের একটি সন্তান জন্মিল না। তাহার দ্বারা আমাদের কোন সজীব ভাব আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। একেবারে বন্ধ্যা যদি বা না

হয় তাহাকে মৃতবৎসা বলিতে পারি, কারণ, প্রথম প্রথম গোটাকতক কবিতা এবং সম্প্রতি অনেকগুলা প্রবন্ধ জন্মলাভ করিয়াছে কিন্তু সংবাদ-পত্রশয্যাতেই তাহারা ভূমিষ্ঠ হয় এবং সংবাদপত্ররাশির মধ্যেই তাহা-দের সমাধি।

আর, আমাদের দুয়ারাণীর ঘরে আমাদের দেশের সাহিত্য, আমাদের দেশের ভাবী আশা ভরসা, আমাদের হতভাগা দেশের একমাত্র স্থায়ী গৌরব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই শিশুটিকে আমরা বড় একটা আদর করি না; ইহাকে প্রাঙ্গণের প্রান্তে উলঙ্গ ফেলিয়া রাখি, এবং সমালোচনা করিবার সময় বলি—ছেলেটার শ্রী দেখ। ইহার না আছে বসন, না আছে ভূষণ; ইহাব সর্ব্বাঙ্গেই ধূলা। ভাল তাই মানিলাম,—ইহার বসন নাই, ভূষণ নাই, কিন্তু ইহার জীবন আছে। এ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। এ মানুষ হইবে এবং সকলকে মানুষ করিবে। আর আমাদের ঐ সুয়ারাণীর মৃত সন্তানগুলিকে বসনে ভূষণে আচ্ছন্ন করিয়া যতই হাতে হাতে কোলে কোলে নাচাইয়া বেড়াইনা কেন কিছুতেই উহাদের মধ্যে জীবনসঞ্চাব করিতে পারিব না।

আমরা যে কয়টি লোক বঙ্গভাষার আহ্বানে একত্র আকৃষ্ট হই-য়াছি, আপনাদের যথাসাধ্য শক্তিতে এই শিশু সাহিত্যটিকে মানুষ করি-বার ভার লইয়াছি—আমরা যদি এই অভূষিত ধূলিমলিন শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অহঙ্কার করি, ভরসা করি কেহ কিছু মনে করিবেন না। যাঁহারা রাজসভায় বসিতেছেন তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা প্রজাসভায় বসি-তেছেন তাঁহাদের জয়জয়কাব,—আমরা এই উপেক্ষিত অধীন দেশের প্রচলিত ভাষায় অন্তরের সুখ দুঃখ বেদনা প্রকাশ করি, ঘরেব কড়ি খরচ কবিয়া তাহা ছাপাই এবং ঘরের কড়ি খরচ করিয়া কেহ তাহা কিনিতে চাহেন না—আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া কেবল একটুখানি অহঙ্কার করিতে দিবেন। সেও বর্ত্তমানের অহঙ্কার নহে ভবিষ্যতের

অহঙ্কার—আমাদের নিজের অহঙ্কার নহে, ভাবী বঙ্গদেশের, সম্ভবত ভাবী ভারতবর্ষের অহঙ্কার! তখন আমরাই বা কোথায় থাকিব, আর এখনকার দিনের উড্ডীয়মান বড় বড় জয়পতাকাগুলিই বা কোথায় থাকিবে! কিন্তু এই সাহিত্য তখন অঙ্গদকুণ্ডলউষ্ণীষে ভূষিত হইয়া সমস্ত জাতির হৃদয়সিংহাসনে রাজমহিমায় বিরাজ করিবে এবং সেই ঐশ্বর্য্যের দিনে মাঝে মাঝে এই বাল্য সুহৃদদিগের নাম তাহার মনে পড়িবে, এই স্নেহের অহঙ্কারটুকু আমাদের আছে।

আজ আমরা এ কথা বলিয়া অলীক গর্ব্ব করিতে পারিব না, যে, আমাদের অগ্যকার তরুণ বঙ্গসাহিত্য পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যশালী বয়স্ক সাহিত্য-সমাজে স্থান পাইবার অধিকারী হইয়াছে—বঙ্গসাহিত্যের যশস্বিবৃন্দের সংখ্যা অত্যল্প, আজিও বঙ্গসাহিত্যের আদরণীয় গ্রন্থ গণনায় যৎসামান্য, এ কথা স্বীকার করি, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তথাপি বঙ্গসাহিত্যকে ক্ষুদ্র মনে হয় না। সে কি কেবল অনুরাগের অন্ধ মোহবশত? তাহা নহে। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি সময় আসিয়াছে যখন সে আপন ভাবী সম্ভাবনাকে আপনি সচেতন ভাবে অনুভব করিতেছে। এই জন্য বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ ফল তুচ্ছ হইলেও সে আপনাকে অবহেলাযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। বসন্তের প্রথম অভ্যাগমে যখন বনভূমিতলে নবাঙ্কুর এবং তরুশাখায় নব কিশলয়ের প্রচুর উদ্গম অনারব্ধ আছে—যখন বনশ্রী আপন অপরিসীম পুষ্পৈশ্বর্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই—তখনও সে যেমন আপন অঙ্গে প্রত্যঙ্গে শিরায় উপশিরায় এক নিগূঢ় জীবনরস-সঞ্চার, এক বিপুল ভাবী মহিমা উপলব্ধি করিয়া আসন্ন যৌবনগর্ব্বে সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠে;—সেইরূপ আজ বঙ্গসাহিত্য আপন অন্তরের মধ্যে এক নূতন প্রাণশক্তি, এক বৃহৎ বিশ্বাসের পুলক অনুভব করিয়াছে—সমস্ত বঙ্গহৃদয়ের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন সে

আপনার নাড়ীর মধ্যে উপলব্ধি করিতেছে—সে জানিতে পারিয়াছে সমস্ত বাঙালীর অন্তর-অন্তঃপুরের মধ্যে তাহার স্থান হইয়াছে; এখন সে ভিখারিণীবেশে কেবল ক্ষমতাশালীর দ্বারে দাঁড়াইয়া নাই, তাহার আপন গৌরবের প্রাসাদে তাহার অক্ষুণ্ণ অধিকার প্রতিদিন বিস্তৃত এবং দৃঢ় হইতে চলিয়াছে। এখন হইতে সে শয়নে স্বপনে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সমস্ত বাঙালীর

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

নববঙ্গসাহিত্য অদ্য প্রায় একশত বৎসর হইল জন্মলাভ করিয়াছে; আর এক শত বৎসর পরে যদি এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সভার শততম বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হয় তবে সেই উৎসব সভায় যে সৌভাগ্যশালী বক্তা বঙ্গসাহিত্যের জয়গান করিতে দণ্ডায়মান হইবেন, তিনি আমাদের মত প্রমাণরিক্তহস্তে কেবলমাত্র অন্তরের আশা এবং অনুরাগ, কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষার আবেগ লইয়া, কেবলমাত্র অপরিস্ফুট অনাগত গৌরবের সূচনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতিপ্রত্যুষের অকস্মাৎ-জাগ্রত একক বিহঙ্গের অনিশ্চিত মৃদু কাকলীর স্বরে সুর বাঁধিবেন না—তিনি স্ফুটতর অরুণালোকে জাগ্রত বঙ্গকাননে বিবিধ কণ্ঠের বিচিত্র কলগানের অধিনেতা হইয়া বর্ত্তমানের উৎসাহে আনন্দধ্বনি উচ্ছ্রিত করিয়া তুলিবেন—এবং কোন কালে যে অমানিশীথের একাধিপত্য ছিল, এবং অদ্যকার আমরা, যে, প্রদোষের অন্ধকারে ক্লান্তি এবং শান্তি আশা এবং নৈরাশ্যের দ্বিধার মধ্যে সকরুণ দুর্ব্বল কণ্ঠের গীতগান সমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম সে কথা কাহারও মনেও থাকিবে না।

১৩০১।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দীনেশচন্দ্রবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে পুস্তকখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া আমরা দ্বিতীয়বার আনন্দলাভ করিলাম।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল, তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড় একটা ব্যাপার যে আছে, তাহা আমরা জানিতাম না,—তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয়স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম।

দ্বিতীয়বার পাঠে গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছি। এবারে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকারদের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত পরিচয়ে বা তুলনামূলক সমালোচনায় আমাদের মন আকর্ষণ করে নাই —আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্রশাখাপ্রশাখা-সম্পন্ন ইতিহাস-বনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।

যে সকল গ্রন্থকে বাংলার ইতিহাস বলে, তাহাও পড়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বাদ্‌শাহদের সহিত নবাবদের, নবাবদের সহিত বিদেশী বণিক্‌দের, ও বণিক্‌দের সহিত দেশী ষড়্‌যন্ত্রকারীদের কি খেলা চলিতে-ছিল, তাহার অনেক সত্যমিথ্যা বিবরণ পাওয়া যায়। সে সকল বিবরণ যদি কোন দৈবঘটনায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, তবে বাংলাদেশকে চিনিবার পক্ষে অল্পই ব্যাঘাত ঘটে। বাংলাদেশের সহিত নবাবদের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহার বিবরণ বাংলাসাহিত্যের ইতস্তত যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাই পর্য্যাপ্ত—তাহার অতিরিক্ত যাহা পাঠ্যগ্রন্থে আলোচিত হয়, তাহা ব্যক্তিগত কাহিনীমাত্র।

কিন্তু দীনেশবাবুর এই গ্রন্থে হুসেন সা, পরাগল খাঁ, ছুটিখাঁর সহিত আমাদের যেটুকু পরিচয় হইয়াছে, তাহাতে ইতিহাস আমাদের কাছে অনেকটা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান ও হিন্দু যে কত কাছাকাছি ছিল, নানা উপদ্রব-উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যে হৃদ্যতার পথ ছিল, ইহা এমন একটি কথা, যাহা যথার্থই জ্ঞাতব্য, যাহা প্রকৃতপক্ষেই ঐতিহাসিক। ইহা দেশের কথা, ইহা লোকবিশেষের সংবাদবিশেষ নহে।

যেমন ভূস্তরপর্য্যায়ে ভূমিকম্প, অগ্নিউচ্ছাস, জলপ্লাবন, তুষারসংহতি, কালে কালে ভূমিগঠনের ইতিহাস নানা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে এবং বৈজ্ঞানিক সেই লিপি উদ্‌ঘাটন করিয়া বিচিত্র সৃজনশক্তির রহস্যলীলা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করেন—তেমনি যে সকল প্রলয়শক্তি ও সৃজনশক্তি অদৃশ্যভাবে সমাজকে পরিণতিদান করিয়া আসিয়াছে, সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত হইয়া যায়। সেই নিগূঢ় ইতিহাসটি উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে প্রকৃতভাবে—সজীবভাবে আমাদের দেশকে আমরা জানিতে পারি। রাজার দপ্তর ঘাঁটিয়া যে সকল কীটজর্জ্জর দলিল পাওয়া যায়, তাহাতে অনেক সময়ে কেবলমাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্ত ও অনেক সময়ে ভুল ইতিহাসের সৃষ্টি হইতে পারে—কারণ, তাহাকে তাহার যথাস্থান ও যথাসময় হইতে, তাহার চারিপাশ হইতে বিচ্যুত আকারে যখন দেখি, তখন কল্পনা ও প্রবৃত্তির বিশেষ ঝোঁকে তাহাকে অসত্যরূপে বড় বা অসত্যরূপে ছোট করিয়া দেখিতে পারি।

বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী ভারতবর্ষই বর্ত্তমান ভারতবর্ষ। সেই যুগের অন্তিম অবস্থায় যখন গৌড়ের রাজসিংহাসন ক্ষণে ক্ষণে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বের মধ্যে দোলায়মান হইতেছিল, তখন প্রজাসাধারণের মধ্যে সমাজ যে স্থিরভাবে ছিল, তাহা সম্ভব নহে। তখনকার সেই আধ্যাত্মিক অরাজকতার মধ্যে বাংলাদেশে যেন একটা দেবদেবীর লড়াই বাধিয়া-

ছিল—তখন সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম-সমেত এক দেবতার মন্দির আর এক দেবতা অধিকার করিয়া পূজার্চ্চনায় নানাপ্রকার মিশ্রণ উৎপন্ন করিতেছিল। তখন এক দেবতার বিগ্রহে আর এক দেবতার সঞ্চার, এক সম্প্রদায়ের তীর্থে আর এক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব, এমনি একটা বিপর্য্যয়ব্যাপার ঘটিতেছিল। ঠিক সেই সময়কার কথা সাহিত্যে আমরা স্পষ্ট করিয়া খুঁজিয়া পাই না।

ইহা দেখিতেছি, বৈদিককালের দেবতন্ত্রে মহাদেবের আধিপত্য নাই। তাহার পরে দীর্ঘকালের ইতিহাসহীন নিস্তব্ধতা কাটিয়া গেলে দেখিতে পাই, ইন্দ্র ও বরুণ ছায়ার মত অস্পষ্ট হইয়া গেছে, এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দ্বন্দ্ব ও মিলন ঘটিতেছে। এই দৈবসংগ্রামে ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমেই পূজাগৃহ হইতে দূরে আশ্রয় লইলেন, বিষ্ণু নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে নানা আকারে নিজের দাবী রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং মহেশ্বর এক সময়ে অধিকাংশ ভারত অধিকার করিয়া লইলেন।

এই সকল দেবদ্বন্দ্বের মূল কোথায়, তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। ভারতবর্ষের কটাহে আর্য্য, অনার্য্য, নানা জাতির সম্মিশ্রণ হইয়াছিল। এক এক সময়ে এক এক জাতি যুটিয়া উঠিয়া আপন আপন দেবতাকে জয়ী করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই অনবরত বিপ্লবের সময় হিন্দুর প্রতিভা সমস্ত বিরোধবিপ্লবের মধ্যে আপনার ঐক্যসূত্র বিস্তার করিয়া নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আর্য্য-অনার্য্যের সমন্বয়-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল।

কথাসরিৎসাগরে আছে, একদা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হিমাদ্রিপাদমূলে কঠোর তপস্যা সহকারে ধূর্জ্জটির আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিব তুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা শিবকেই নিজের পুত্ররূপে লাভ করিবার প্রার্থনা করিলেন। এই অনুচিত আকাঙ্ক্ষার জন্য তিনি নিন্দিত ও লোকের নিকট অপূজ্য হইলেন। বিষ্ণু এই বর চাহিলেন,

যেন আমি তোমারই সেবাপর হইতে পারি। শিব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে নিজের অর্দ্ধাঙ্গ করিয়া লইলেন। সেই অর্দ্ধাঙ্গই শিবের শক্তিরূপিণী পার্ব্বতী।

এক এক সময়ে এক এক দেবতা বড় হইয়া অন্যান্য দেবতাকে কিরূপে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই গল্পেই তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্মা, যিনি চারি বেদের চতুর্ম্মুখ বিগ্রহস্বরূপ, তিনি বেদবিদ্রোহী বৌদ্ধযুগে অধঃকৃত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু, যিনি বেদে ব্রাহ্মণদের দেবতা ছিলেন, তিনিও একসময়ে হীনবল হইয়া এই শ্মশানচারী কপালমালী দিগম্বরের পশ্চাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিবের যখন প্রথম অভ্যুত্থান হইয়াছিল, তখন বৈদিকদেবতারা যে তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে স্থান দিতে চান নাই, তাহা দক্ষযজ্ঞের বিবরণেই বুঝা যায়। বস্তুতই তখনকার অন্যান্য আর্য্যদেবতার সহিত এই ত্রিলোচনের অত্যন্ত প্রভেদ। দক্ষের মুখে যে সকল নিন্দা বসান হইয়াছিল, তখনকার আর্য্যমণ্ডলীর মুখে সে নিন্দা স্বাভাবিক। সমস্ত দেবমণ্ডলীর মধ্যে ভূতপ্রেতপিশাচের দ্বারা এই অদ্ভুত দেবতাকর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞধ্বংস কেবল কাল্পনিক কথা নহে। ইহা একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের তুল্য। আর্য্যমণ্ডলীর যে বৈদিকযজ্ঞে প্রাচীন আর্য্যদেবতারা আহূত হইতেন, সেই যজ্ঞে এই শ্মশানেশ্বরকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই এবং তাঁহাকে অনার্য্য অনাচারী বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছিল; সেই কারণে তাঁহার সেবকদের সহিত আর্য্যদেব-পূজকদের প্রচণ্ড বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে অনার্য্য ভূত-প্রেতপিশাচের দ্বারা বৈদিকযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় এবং সেই শোণিতাক্ত অপবিত্র যজ্ঞবেদীর উপরে নবাগত দেবতার প্রাধান্য বলপূর্ব্বক স্থাপিত হয়।

আর্য্যদেবসমাজে এই অদ্ভুতাচারী দেবতা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু ইঁহাকে অনেক জবাবদিহি করিতে হইয়াছিল। কথাসরিৎ-

সাগরেই আছে, একদা পার্ব্বতী শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরকপালে এবং শ্মশানে তোমার এমন প্রীতি কেন?"

এ প্রশ্ন তখনকার আর্য্যমণ্ডলীর প্রশ্ন। আমাদের আর্য্যদেবতারা স্বর্গবাসী, তাঁহারা বিকৃতিহীন, সুন্দর, সম্পৎশালী। যে দেবতা স্বর্গ-বিহারী নহেন, ভস্ম, নৃমুণ্ড, রুধিরাক্ত হস্তিচর্ম্ম যাঁহার সাজ তাঁহার নিকট হইতে কোন কৈফিয়ৎ না লইয়া তাঁহাকে দেবসভায় স্থান দেওয়া যায় না।

মহেশ্বর উত্তর করিলেন, "কল্পাবসানে যখন জগৎ জলময় ছিল, তখন আমি উরু ভেদ করিয়া একবিন্দু রক্তপাত করি। সেই রক্ত হইতে অণ্ড জন্মে, সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তৎপরে আমি বিশ্বসৃজনের উদ্দেশে প্রকৃতিকে সৃজন করি। সেই প্রকৃতি-পুরুষ হইতে অন্যান্য প্রজাপতি ও সেই প্রজাপতিগণ হইতে অখিল প্রজার সৃষ্টি হয়। তখন, আমিই চরাচরের সৃজনকর্ত্তা বলিয়া ব্রহ্মার মনে দর্প হইয়াছিল। সেই দর্প সহ্য করিতে না পারিয়া আমি ব্রহ্মার মুণ্ডচ্ছেদ করি—সেই অবধি আমার এই মহাব্রত, সেই অবধিই আমি কপালপাণি ও শ্মশানপ্রিয়।"

এই গল্পের দ্বারা একদিকে ব্রহ্মার পূর্ব্বতন প্রাধান্যচ্ছেদন ও ধূর্জ্জটির আর্য্যরীতিবহির্ভূত অদ্ভুত আচারেরও ব্যাখ্যা হইল। এই মুণ্ডমালী প্রেতেশ্বর ভীষণ দেবতা আর্য্যদের হাতে পড়িয়া ক্রমে কিরূপ পরম শান্ত যোগরত মঙ্গলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৈরাগ্যবানের ধ্যানের সামগ্রী হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অগোচর নাই। কিন্তু তাহাও ক্রমশ হইয়াছিল। অধুনাতন-কালে দেবী চণ্ডীর মধ্যে যে ভীষণ চঞ্চলভাবের আরোপ করা হইয়াছে, এক সময়ে তাহা প্রধানত শিবের ছিল। শিবের এই ভীষণত্ব কালক্রমে চণ্ডীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া শিব একান্ত শান্ত-নিশ্চল যোগীর ভাব প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্নরজাতিসেবিত হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিয়া কোন্ শুভ্রকায় রজতগিরিনিভ প্রবলজাতি এই দেবতাকে বহন করিয়া আনিয়াছে? অথবা ইনি লিঙ্গপূজক দ্রাবিড়গণের দেবতা, অথবা ক্রমে উভয়-দেবতায় মিশ্রিত হইয়া ও আর্য্য-উপাসকগণকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া এই দেবতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় আর্য্যদেবতত্ত্বের ইতিহাসে আলোচ্য। সে ইতিহাস এখনো লিখিত হয় নাই। আশা করি, তাহার অন্য ভাষা হইতে অনুবাদের অপেক্ষায় আমরা বসিয়া নাই।

কখনো সাংখ্যের ভাবে, কখনো বেদান্তের ভাবে, কখনো মিশ্রিত ভাবে, এই শিব-শক্তি কখনো বা জড়িত হইয়া, কখনো বা স্বতন্ত্র হইয়া, ভারতবর্ষে আবর্ত্তিত হইতেছিলেন। এই রূপান্তরের কালনির্ণয় দুরূহ। ইহার বীজ কখন্ ছড়ান হইয়াছিল এবং কোন্ বীজ কখন্ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সন্ধান করিতে হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বিপুল-ভারতসমাজ-গঠনে নানাজাতীয় স্তর যে মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা নিয়তই আমাদের ধর্ম্মপ্রণালীর নানা বিসদৃশ ব্যাপারের বিরোধ ও সমন্বয়চেষ্টায় স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহাও বুঝা যায়, অনার্য্যগণ মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং আর্য্যগণ তাহাদের অনেক আচার-ব্যবহার-পূজাপদ্ধতির দ্বারা অভিভূত হইয়াও আপন প্রতিভাবলে সে-সমস্তকে দার্শনিক ইন্দ্রজালদ্বারা আর্য্য আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া লইতেছিলেন। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেক দেবদেবীর কাহিনীতে এত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা—একই পদার্থের মধ্যে এত বিরুদ্ধ ভাবের ও মতের সমাবেশ।

এককালে ভারতবর্ষে প্রবলতাপ্রাপ্ত অনার্য্যদের সহিত ব্রাহ্মণপ্রধান আর্য্যদের দেবদেবী-ক্রিয়াকর্ম্ম লইয়া এই যে বিরোধ বাধিয়াছিল—সেই বহুকালব্যাপী বিপ্লবের মৃদুতর আন্দোলন সেদিন পর্য্যন্ত

বাংলাকেও আঘাত করিতেছিল, দীনেশবাবুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়িলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য পড়িলে দেখিতে পাই, শিব যখন ভারত-বর্ষের মহেশ্বর, তখন কালিকা অন্যান্য মাতৃকাগণের পশ্চাতে মহাদেবের অনুচরীবৃত্তি করিয়াছিলেন। ক্রমে কখন্ তিনি করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শিবকেও অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার ক্রমপরম্পরা নির্দ্দেশ করার স্থান ইহা নহে, ক্ষমতাও আমার নাই। কুমারসম্ভব কাব্যে বিবাহকালে শিব যখন হিমাদ্রিভবনে চলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পশ্চাতে মাতৃকাগণ এবং—

> তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং
> কালী কপালাভরণা চকাশে।

তাঁহাদেরও পশ্চাতে কপালভূষণা কালী প্রকাশ পাইতেছিলেন। এই কালীর সহিত মহাদেবের কোন ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় নাই।

মেঘদূতে গোপবেশী বিষ্ণুর কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু মেঘের ভ্রমণ-কালে কোন মন্দির উপলক্ষ্য করিয়া বা উপমাচ্ছলে কালিকাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্পষ্টই দেখা যায়, তৎকালে ভদ্রসমাজের দেবতা ছিলেন মহেশ্বর। মালতীমাধবেরও করালাদেবীর পূজোপচারে যে নৃশংস বীভৎসতা দেখা যায়, তাহা কখনই আর্য্যসমাজের ভদ্রমণ্ডলীর অনুমোদিত ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি না।

এক সময়ে এই দেবীপূজা যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত ছিল, তাহা কাদম্বরীতে দেখা যায়। মহাশ্বেতাকে শিবমন্দিরেই দেখি; কিন্তু কবি ঘৃণার সহিত অনার্য্য শবরের পূজাপদ্ধতির যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, পশুরুধিরের দ্বারা দেবতার্চ্চন ও মাংসদ্বারা বলিকর্ম্ম তখন ভদ্র-মণ্ডলীর কাছে নিন্দিত ছিল। কিন্তু সেই ভদ্রমণ্ডলীও পরাস্ত হইয়া-

ছিলেন। সেই সামাজিক মহোৎপাতের দিনে নীচের জিনিষ উপরে এবং উপরের জিনিষ নীচে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

বঙ্গসাহিত্যের আরম্ভস্তরে সেই সকল উৎপাতের চিহ্ন লিখিত আছে। দীনেশবাবু অদ্ভুত পরিশ্রমে ও প্রতিভায় এই সাহিত্যের স্তরগুলি যথাক্রমে বিন্যাস করিয়া বঙ্গসমাজের নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন।

তিনি যে ধর্ম্মকলহব্যাপারের সম্মুখে আমাদিগকে দণ্ডায়মান করিয়াছেন, সেখানে বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের দেবতা শিবের বড় দুর্গতি। তাঁহার এতকালের প্রাধান্য "মেয়ে দেবতা" কাড়িয়া লইবার জন্য রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—শিবকে পরাস্ত হইতে হইল।

স্পষ্টই দেখা যায়, এই কলহ বিশিষ্ট দলের সহিত ইতর সাধারণের কলহ। উপেক্ষিত সাধারণ যেন তাহাদের প্রচণ্ডশক্তি মাতৃদেবতার আশ্রয় লইয়া ভদ্রসমাজের শান্ত-সমাহিত-নিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক যোগীশ্বরকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

এক সময়ে বেদ তাহার দেবতাগণকে লইয়া ভারতবর্ষের চিত্তক্ষেত্র হইতে দূরে গিয়াছিল বটে, কিন্তু বেদান্ত এই স্থাণুকে ধ্যানের আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া জ্ঞানী, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু এই জ্ঞানীর দেবতা অজ্ঞানীদিগকে আনন্দদান করিত না, জ্ঞানীরাও অজ্ঞানীদিগকে অবজ্ঞাভরে আপন অধিকার হইতে দূরে রাখিতেন। ধন এবং দারিদ্র্যের মধ্যেই হোক্, উচ্চপদ ও হীনপদের মধ্যেই হোক্ বা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যেই হোক্, যেখানে এত-বড় একটা বিচ্ছেদ ঘটে, সেখানে ঝড় না আসিয়া থাকিতে পারে না। গুরুতর পার্থক্যমাত্রই ঝড়ের কারণ।

আর্য্য-অনার্য্য যখন মেশে নাই, তখনো ঝড় উঠিয়াছিল, আবার ভদ্র-

অভদ্র-মণ্ডলীতে জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ যখন অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল, তখনো ঝড় উঠিয়াছে।

শঙ্করাচার্য্যের ছাত্রগণ যখন বিদ্যাকেই প্রধান করিয়া তুলিয়া জগৎকে মিথ্যা ও কর্ম্মকে বন্ধন বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলেন—তখন সাধারণে মায়াকেই, শান্তস্বরূপের শক্তিকেই মহামায়া বলিয়া শক্তীশ্বরের ঊর্দ্ধে দাঁড় করাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। মায়াকে মায়াধিপতির চেয়ে বড় বলিয়া ঘোষণা করা, এই এক বিদ্রোহ।

ভারতবর্ষে এই বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত কবে হইয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু এই বিদ্রোহ দেখিতে দেখিতে সর্ব্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। কারণ, ব্রহ্মের সহিত জগৎকে ও আত্মাকে প্রেমের সম্বন্ধে যোগ করিয়া না দেখিলে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হয় না। তাঁহার সহিত জগতের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলেই জগৎ মিথ্যা—সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই জগৎ সত্য। যেখানে ব্রহ্মের শক্তি বিরাজমান, সেইখানেই ভক্তের অধিকার, যেখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সেখানে ভক্তির মাৎসর্য্য উপস্থিত হয়। ব্রহ্মের শক্তিকে ব্রহ্মের চেয়ে বড় বলা ভক্তির মাৎসর্য্য—কিন্তু তাহা ভক্তি;—শক্তির পরিচয়কে একেবারেই অসত্য বলিয়া গণ্য করাতে ও তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ হইবার চেষ্টা করাতেই ক্ষুব্ধ ভক্তি যেন আপনার তীর লঙ্ঘন করিয়া উদ্বেল হইয়াছিল।

এইরূপ বিদ্রোহকালে শক্তিকে উৎকটরূপে প্রকাশ করিতে গেলে, প্রথমে তাহার প্রবলতা, তাহার ভীষ্মতাই জাগাইয়া তুলিতে হয়। তাহা ভয় হইতে রক্ষা করিবার সময় মাতা ও ভয় জন্মাইবার সময় চণ্ডী। তাহার ইচ্ছা কোন বিধিবিধানের দ্বারা নিয়মিত নহে—তাহা বাধাবিহীন লীলা, কখন্ কি করে, কেন কি রূপ ধরে, তাহা বুঝিবার জো নাই, এইজন্য তাহা ভয়ঙ্কর।

নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ডতার ঝড়। নারী যেমন স্বামীর

নিকট হইতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের স্বাদবিহীন মৃদুতা অপেক্ষা প্রবল শাসন ভালবাসে, বিদ্রোহী ভক্ত সেইরূপ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাময়ী শক্তিকে ভীষণতার মধ্যে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিতে ইচ্ছা করিল।

শিব আর্য্যসমাজে ভিড়িয়া যে ভীষণতা, যে শক্তির চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিলেন, নিম্নসমাজে তাহা নষ্ট হইতে দিল না। যোগানন্দের শান্ত ভাবকে তাহারা উচ্চশ্রেণীর জন্য রাখিয়া ভক্তির প্রবল উত্তেজনার আশায় শক্তির উগ্রতাকেই নাচাইয়া তুলিল। তাহারা শক্তিকে শিব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া বিশেষভাবে শক্তির পূজা খাড়া করিয়া তুলিল।

কিন্তু কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, ঝড় কখনই চিরদিন থাকিতে পারে না। ভক্তহৃদয় এই চণ্ডীশক্তিকে মাধুর্য্যে পরিণত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিল। প্রেম সকল শক্তির পরিণাম তাহা চূড়ান্ত শক্তি বলিয়াই তাহার শক্তিরূপ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ভক্তির পথ কখনই প্রচণ্ডতার মধ্যে গিয়া থামিতে পারে না—প্রেমের আনন্দেই তাহার অবসান হইতে হইবে। বস্তুত মাঝখানে শিবের ও শক্তির যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রেমের মধ্যে সেই শিব-শক্তির কতকটা সম্মিলনচেষ্টা দেখা যাইতেছে। মায়াকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিলে তাহা ভয়ঙ্করী, ব্রহ্মকে মায়া হইতে স্বতন্ত্র করিলে ব্রহ্ম অনধিগম্য—ব্রহ্মের সহিত মায়াকে সম্মিলিত করিয়া দেখিলেই প্রেমের পরিতৃপ্তি।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এই পরিবর্ত্তন-পরম্পরার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগ ও শিবপূজার কালে বঙ্গসাহিত্যের কি অবস্থা ছিল, তাহা দীনেশবাবু খুঁজিয়া পান নাই। "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" প্রবাদে বুঝা যায়, শিবের গীত এক-সময়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে সমস্তই সাহিত্য হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের যে সকল চিহ্ন ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলও বৌদ্ধযুগের বহুপরবর্ত্তী।

আমাদের চক্ষে বঙ্গসাহিত্যমঞ্চের প্রথম যবনিকাটি যখন উঠিয়া গেল, তখন দেখি, সমাজে একটি কলহ বাধিয়াছে—সে দেবতার কলহ। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানির পঞ্চম অধ্যায়ে দীনেশবাবু প্রাচীন শিবের প্রতি চণ্ডী, বিষহরি ও শীতলার আক্রমণব্যাপার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল স্থানীয় দেবদেবীরা জনসাধারণের কাছে বল পাইয়া কিরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে—দেবী চণ্ডী নিজের পূজাস্থাপনের জন্য অস্থির। যেমন করিয়া হউক ছলে-বলে-কৌশলে মর্ত্ত্যে পূজা প্রচার করিতে হইবেই। ইহাতেই বুঝা যায়, পূজা লইয়া একটা বাদবিবাদ আছে। তাহার পর দেখি, যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া দেবী পূজা-প্রচার করিতে উদ্যত, তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক নহে। যে নীচের, তাহাকেই উপরে উঠাইবেন—ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এমন সান্ত্বনা—এমন বলের কথা আর কি আছে! যে দরিদ্র, দুইবেলা আহার জোটাইতে পারে না, সে-ই শক্তির লীলায় সোণার ঘড়া পাইল; যে ব্যাধ নীচজাতীয় ভদ্রজনের অবজ্ঞা-ভাজন, সে-ই মহত্ত্বলাভ করিয়া কলিঙ্গরাজের কন্যাকে বিবাহ করিল;—ইহাই শক্তির লীলা।

তাহার পরে দেখি, শিবের পূজাকে হতমান করিয়াই নিজের পূজা প্রচার করা দেবীর চেষ্টা। শিব তাঁহার স্বামী বটেন, কিন্তু তাহাতে কোন সঙ্কোচ নাই। শিবের সহিত শক্তির এই লড়াই। এই লড়াইয়ে পদে পদে দয়ামায়া বা ন্যায়-অন্যায় পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ব্যাধের গল্পে দেখিতে পাই, শক্তির ইচ্ছায় নীচ উচ্চে উঠিয়াছে। কেন উঠিয়াছে, তাহার কোন কারণ নাই—ব্যাধ যে ভক্ত ছিল, এমনো পরিচয় পাই না। বরঞ্চ সে দেবীর বাহন সিংহকে মারিয়া দেবীর ক্রোধভাজন হইতেও পারিত। কিন্তু দেবী

নিতান্তই যথেচ্ছাক্রমে তাহাকে দয়া করিলেন। ইহাই শক্তির খেলা।

ব্যাধকে যেমন বিনা কারণে দেবী দয়া করিলেন, কলিঙ্গরাজকে তেমনি তিনি বিনা দোষে নিগ্রহ করিলেন। তাহার দেশ জলে ডুবাইয়া দিলেন। জগতে ঝড়, জলপ্লাবন, ভূমিকম্পে যে শক্তির প্রকাশ দেখি, তাহার মধ্যে ধর্ম্মনীতিসঙ্গত কার্য্যকারণমালা দেখা যায় না এবং সংসারে সুখদুঃখবিপৎসম্পদের যে আবর্ত্তন দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেও ধর্ম্মনীতির সুসঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দেখিতেছি, যে শক্তি নির্ব্বিচারে পালন করিতেছে, সেই শক্তিই নির্ব্বিচারে ধ্বংস করিতেছে। এই অহৈতুক পালনে এবং অহৈতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নাই। এই দয়ামায়াহীন ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিত শক্তিকে বড় করিয়া দেখা তখনকার কালের পক্ষে বিশেষ স্বাভাবিক ছিল।

তখন নীচের লোকের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও উপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্ব্বদাই দেখা যাইত। হীনাবস্থার লোক কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া অরণ্য কাটিয়া নগর বানাইয়াছে এবং প্রতাপশালী রাজা হঠাৎ পরাস্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। তখনকার নবাব-বাদশাহদের ক্ষমতাও বিধিবিধানের অতীত ছিল—তাঁহাদের খেয়ালমাত্রে সমস্ত হইতে পারিত। ইঁহারা দয়া করিলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নীচ মহৎ হইত, ভিক্ষুক রাজা হইত। ইঁহারা নির্দ্দয় হইলে ধর্ম্মের দোহাইও কাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। ইহাই শক্তি।

এই শক্তির প্রসন্ন মুখ মাতা, এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী। ইঁহারই "প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ—সেইজন্য সর্ব্বদাই করজোড়ে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন, ততক্ষণ তাহার সাত-খুন মাপ—যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র, ততক্ষণ তাহার সঙ্গত-অসঙ্গত সকল আবদারই অনায়াসে পূর্ণ হয়।

এইরূপ শক্তি ভয়ঙ্করী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার কোন সীমা নাই। আমি অন্যায় করিলেও জয়ী হইতে পারি, আমি অক্ষম হইলেও আমার দুরাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হইতে পারে। যেখানে নিয়মের বন্ধন, ধর্ম্মের বিধান আছে, সেখানে দেবতার কাছেও প্রত্যাশাকে খর্ব্ব করিয়া রাখিতে হয়।

এই সকল কারণে যে সময় বাদশাহ ও নবাবের অপ্রতিহত ইচ্ছা জনসাধারণকে ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং ন্যায়-অন্যায় সম্ভব-অসম্ভবের ভেদচিহ্নকে ক্ষীণ করিয়া আনিয়াছিল, হর্ষ-শোক বিপৎ-সম্পদের অতীত শান্ত-সমাহিত বৈদান্তিক শিব সে-সময়কার সাধারণের দেবতা হইতে পারেন না। রাগদ্বেষ প্রসাদ-অপ্রসাদের লীলাচঞ্চলা যদৃচ্ছাচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরমাদর্শ। সেইজন্যই তখনকার লোকে ঈশ্বরকে অপমান করিয়া বলিত—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।"

কবিকঙ্কণে দেবী এই যে ব্যাধের দ্বারা নিজের পূজা মর্ত্ত্যে প্রচার করিলেন, স্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র যে ব্যাধরূপে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিল, বাংলা দেশের এই লোকপ্রচলিত কথার কি কোন ঐতিহাসিক অর্থ নাই? পশুবলি প্রভৃতির দ্বারা যে ভীষণ পূজা এক কালে ব্যাধের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেই পূজাই কি কালক্রমে উচ্চসমাজে প্রবেশলাভ করে নাই? কাদম্বরীতে বর্ণিত শবরনামক ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধজাতির পূজাপদ্ধতিতেও ইহারই কি প্রমাণ দিতেছে না? উড়িষ্যাই কলিঙ্গদেশ। বৌদ্ধ-ধর্ম্মলোপের পর উড়িষ্যায় শৈবধর্ম্মের প্রবল অভ্যুদয় হইয়াছিল—ভুবনেশ্বর তাহার প্রমাণ। কলিঙ্গের রাজারাও প্রবল রাজা ছিলেন। এই কলিঙ্গরাজত্বের প্রতি শৈবধর্ম্মবিদ্বেষীদের আক্রোশ প্রকাশ—ইহার মধ্যেও দূর ইতিহাসের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়।

ধনপতির গল্পে দেখিতে পাই, উচ্চজাতীয় ভদ্রবৈশ্য শিবোপাসক।

শুদ্ধমাত্র এই পাপে চণ্ডী তাঁহাকে নানা দুর্গতির দ্বারা পরাস্ত করিয়া আপন মাহাত্ম্য প্রমাণ করিলেন।

বস্তুত সাংসারিক সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিঁকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ, তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয়, আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতি-লাভ করিতেছিলেন? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা, ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া, ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়! কিন্তু যে দেবতা বলেন, সুখ-দুঃখ, দুর্গতি-সদ্গতি, ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ও দিকে দৃক্পাত করিয়ো না, সংসারে তাঁহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে;—সংসার, মুখে যাহাই বলুক্, মুক্তি চায় না, ধন-জন-মান চায়। ধনপতির মত ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদা-শিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, ধন-পতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল।

কিন্তু তখনকার নানাবিভীষিকাগ্রস্ত পরিবর্ত্তনব্যাকুল দুর্গতির দিনে শক্তিপূজারূপে এই যে প্রবলতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা আমা-দের মনুষ্যত্বকে চিরদিন পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। যে ফলের মিষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে, সে প্রথম অবস্থার তীব্র অম্লত্ব পক্ব অবস্থায়

পরিহার করে। যথার্থ ভক্তি সুতীব্র কঠিন শক্তিকে গোড়ায় যদি-বা প্রাধান্য দেয়, শেষকালে তাহাকে উত্তরোত্তর মধুর, কোমল ও বিচিত্র করিয়া আনে। বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে—মাতা, পত্নী ও কন্যা, রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গল-সুন্দর রূপে দরিদ্র বাঙালীর ঘরে যে রসসঞ্চার করিয়াছেন, চণ্ডীপূজার সেই পরিণাম-রমণীয়তার দৃশ্য দীনেশবাবু তাঁহার এই গ্রন্থে বঙ্গসাহিত্য হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ধার করিয়া দেখান নাই। কালিদাসের কুমারসম্ভব সাহিত্যে দাম্পত্য-প্রেমকে মহীয়ান্ করিয়া এই মঙ্গলভাবটিকে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিস্ফুটতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তথাপি বাঙালীর দরিদ্রগৃহের মধ্যে এই মঙ্গলমাধুর্য্যসিক্ত দেবভাবের অবতারণা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে কিয়ৎপরিমাণে আপনাকে অঙ্কিত করিয়াছে, অন্নদামঙ্গলও তাহার উপর রঙ্ ফলাইয়াছে। কিন্তু মাধুর্য্যের ভাব গীতিকবিতার সম্পত্তি। চণ্ডীপূজা ক্রমে যখন ভক্তিতে স্নিগ্ধ ও রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল। এই সকল বিজয়া-আগমনীর গীত ও গ্রাম্য খণ্ড কবিতাগুলি বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় এগুলি সংগৃহীত হয় নাই। ক্রমে ইহারা নষ্ট ও বিকৃত হইবে, এমন সম্ভাবনা আছে। এক সময়ে ভারতীতে গ্রাম্য সাহিত্য নামক প্রবন্ধে আমি এই কাব্যগুলির আলোচনা করিয়াছিলাম।

চণ্ডী যেমন প্রচণ্ড উপদ্রবে আপনার পূজা প্রতিষ্ঠা করেন, মনসা-শীতলাও তেমনি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। শৈব চাঁদ-সদাগরের দুরবস্থা সকলেই জানেন। বিষহরি, দক্ষিণরায়, সত্যপীর প্রভৃতি আরো অনেক ছোটখাট দেবতা আপন আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এমনি করিয়া সমাজের নিম্নস্তরগুলি প্রবল ভূমিকম্পে

সমাজের উপরের স্তরে উঠিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছিল, দীনেশ-বাবুর গ্রন্থে পাঠকেরা তাহার বিবরণ পাইবেন—এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে।

কিন্তু দীনেশবাবুর সাহায্যে বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, সাহিত্যে বৈষ্ণবই জয়লাভ করিয়াছেন। শঙ্করের অভ্যুত্থানের পর শৈবধর্ম্ম ক্রমশই অদ্বৈতবাদকে আশ্রয় করিতেছিল। বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়, জনসাধারণের ভক্তিব্যাকুল হৃদয়সমুদ্র হইতে, শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই দুই দ্বৈতবাদের ঢেউ উঠিয়া সেই শৈবধর্ম্মকে ভাঙিয়াছে। এই উভয় ধর্ম্মেই ঈশ্বরকে বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছে। শাক্তের বিভাগ গুরুতর। যে শক্তি ভীষণ, যাহা খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাদিগকে দূরে রাখিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয়;—সে আমার সমস্ত দাবী করে, তাহার উপর আমার কোন দাবী নাই। শক্তিপূজায় নীচকে উচ্চে তুলিতে পারে, কিন্তু উচ্চ-নীচের ব্যবধান সমানই রাখিয়া দেয়—সক্ষম-অক্ষমের প্রভেদকে সুদৃঢ় করে। বৈষ্ণবধর্ম্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি—সে শক্তি বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে, তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। তিনি বল ও ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিবার জন্য শক্তিপ্রয়োগ করেন নাই, তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে—এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার আনন্দ নিয়ত মিলনরূপে প্রতিষ্ঠিত। শাক্তধর্ম্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ, বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ। শক্তির লীলায় কে দয়া পায়, কে না পায়, তাহার ঠিকানা নাই; কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে সেখানে সকলেরই নিত্য দাবী। শাক্ত-ধর্ম্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে—বৈষ্ণবধর্ম্মে এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

বৈষ্ণব এইরূপে ভেদের উপরে সাম্যস্থাপন করিয়া প্রেমপ্লাবনে সমা-

জের সকল অংশকে সমান করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, যাহা, পূর্ব্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে, হঠাৎ খাপ্‌ছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্ত বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে দূর হইল, অলঙ্কারশাস্ত্রের পাষাণবন্ধনসকল কেমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সঙ্গীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নহে—দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জ্জিত কালোয়াতি সঙ্গীত থই পাইল না, দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতপ্রণালী তৈরি করিল; আর কোন সঙ্গীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত। মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান্ কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই মন্ত্র যেমনি উচ্চারিত হইল, অমনি দেশের যত পাখী সুপ্ত হইয়া ছিল, সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল।

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে। সেই সময়ে এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা অলোকসামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলাদেশের —যাহা এ দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল। শাক্তযুগে তাহার দীনতা ঘোচে নাই—বরঞ্চ নানারূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল, বৈষ্ণবযুগে অযাচিত-ঐশ্বর্য্য-লাভে সে আশ্চর্য্যরূপে চরিতার্থ হইয়াছে।

শাক্ত যে পূজা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা তখনকার কালের

অনুগামী। অর্থাৎ সমাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে শক্তির খেলা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে সকল আকস্মিক উত্থানপতন লোককে প্রবলবেগে চকিত করিয়া দিতেছিল—মনে মনে তাহাকেই দেবত্ব দিয়া, শাক্তধর্ম্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম এক ভাবের উচ্ছ্বাসে সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক বৃহৎ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিষ্কৃতিদান করিয়াছিল। শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন করিতেছিল, তখনই সে প্রেমের কথা বলিয়াছিল। তখনই সে ভগবান্‌কে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল—এমন কি, প্রেমের স্পর্দ্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্য্যকে উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে করিয়া, যে ব্যক্তি তৃণাদপি নীচ, সে-ও গৌরব লাভ করিল; যে ভিক্ষার ঝুলি লইয়াছে, সে-ও সম্মান পাইল; যে ম্লেচ্ছাচারী, সে-ও পবিত্র হইল। তখন সাধারণের হৃদয় রাজার পীড়ন সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়া গেল। বাহ্য অবস্থা সমানই রহিল, কিন্তু মন সেই অবস্থার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিখিল জগৎসভার মধ্যে স্থানলাভ করিল। প্রেমের অধিকারে, সৌন্দর্য্যের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে কাহারও কোন বাধা রহিল না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই যে ভাবোচ্ছ্বাস, ইহা স্থায়ী হইল না কেন? সমাজে ইহা বিকৃত ও সাহিত্য হইতে ইহা অন্তর্হিত হইল কেন? ইহার কারণ এই যে, ভাবসৃজনের শক্তি প্রতিভার, কিন্তু ভাব রক্ষা করিবার শক্তি চরিত্রের। বাংলাদেশে ক্ষণে ক্ষণে ভাববিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পরিণাম দেখিতে পাই না। ভাব আমাদের কাছে সম্ভোগের সামগ্রী, তাহা কোন কাজের সৃষ্টি করে না, এইজন্য বিকারেই তাহার অবসান হয়।

আমরা ভাব উপভোগ করিয়া অশ্রুজলে নিজেকে প্লাবিত করিয়াছি, কিন্তু পৌরুষলাভ করি নাই, দৃঢ়নিষ্ঠা পাই নাই। আমরা শক্তিপূজায় নিজেকে শিশু কল্পনা করিয়া মা মা করিয়া আবদার করিয়াছি এবং বৈষ্ণব-সাধনায় নিজেকে নায়িকা কল্পনা করিয়া মান-অভিমানে, বিরহ-মিলনে ব্যাকুল হইয়াছি। শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্য্যের পথে লইয়া যায় নাই, প্রেমের পূজা আমাদের মনকে কর্ম্মের পথে প্রেরণ করে নাই। আমরা ভাববিলাসী বলিয়াই আমাদের দেশে ভাবের বিকার ঘটিতে থাকে, এবং এইজন্যই চরিতকাব্য আমাদের দেশে পূর্ণ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। একদিকে দুর্গায় ও আর একদিকে রাধায় আমাদের সাহিত্যে নারীভাবই অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বেহুলা ও অন্যান্য নায়িকার চরিত্র-সমালোচনায় দীনেশবাবু তাহার আভাস দিয়াছেন। পৌরুষের অভাব ও ভাবরসের প্রাচুর্য্য বঙ্গসাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যে দুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া দুই ধারা দুই পথে গিয়াছে—প্রথমটি গেছে বাংলার গৃহের মধ্যে, দ্বিতীয়টি গেছে বাংলার গৃহের বাহিরে। কিন্তু এই দুইটি ধারারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমণী এবং এই দুইটিরই স্রোত ভাবের স্রোত।

যাহা হউক্, বঙ্গসাহিত্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাবের সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গেল, তাহা হইতে সাহিত্যসম্বন্ধে আমরা একটি সাধারণ তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। সমাজের চিত্ত যখন নিজের বর্ত্তমান অবস্থাবন্ধনে বদ্ধ থাকে এবং সমাজের চিত্ত যখন ভাবপ্রাবল্যে নিজের অবস্থার উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, এই দুই অবস্থার সাহিত্যের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক।

সমাজ যখন নিজের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী বেষ্টনের মধ্যে, নিজের বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে, তখনো সে বসিয়া বসিয়া আপনার সেই অবস্থাকে কল্পনার দ্বারা দেবত্ব দিয়া মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে।

সে যেন কারাগারের ভিত্তিতে ছবি আঁকিয়া কারাগারকে প্রাসাদের মত সাজাইতে চেষ্টা পায়। সেই চেষ্টার মধ্যে মানবচিত্তের যে বেদনা—যে ব্যাকুলতা আছে, তাহা বড় সকরুণ। সাহিত্যে সেই চেষ্টার বেদনা ও করুণা আমরা শাক্তযুগের মঙ্গল কাব্যে দেখিয়াছি। তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-উৎপীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্য্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ-অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতেছিল এবং দুঃখক্লেশকে ভাঙাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ—কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু সমাজ যখন পরিব্যাপ্ত ভাবাবেগে নিজের অবস্থাবন্ধনকে লঙ্ঘন করিয়া আনন্দে ও আশায় উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, তখনই সে হাতের কাছে যে তুচ্ছভাষা পায়, তাহাকেই অপরূপ করিয়া তোলে; যে সামান্য উপকরণ পায়, তাহার দ্বারাই ইন্দ্রজাল ঘটাইতে পারে। এই-রূপ অবস্থায় যে কি হইতে পারে ও না পারে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হইতে কেহ অনুমান করিতে পারে না।

একটি নূতন আশার যুগ চাই। সেই আশার যুগে মানুষ নিজের সীমা দেখিতে পায় না—সমস্তই সম্ভব বলিয়া বোধ করে। সমস্তই সম্ভব বলিয়া বোধ করিবামাত্র যে বল পাওয়া যায়, তাহাতেই অনেক অসাধ্য সাধ্য হয় এবং যাহার যতটা শক্তি আছে, তাহা পূর্ণমাত্রায় কাজ করে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

মানব সমাজের সে বাল্যকাল কোথায় গেল, যখন প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, ঘটনা এবং কল্পনা কয়টি ভাই বোনের মত একান্নে এবং একত্রে খেলা করিতে করিতে মানুষ হইয়াছিল! আজ তাহাদের মধ্যে যে এত বড় একটা গৃহবিচ্ছেদ ঘটিবে তাহা কখন কেহ স্বপ্নেও জানিত না।

এক সময়ে রামায়ণ মহাভারত ছিল ইতিহাস। এখনকার ইতিহাস তাহার সহিত কুটুম্বিতা স্বীকার করিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়, বলে, কাব্যের সহিত পরিণীত হইয়া উহার কুল নষ্ট হইয়াছে। এখন তাহার কুল উদ্ধার করা এতই কঠিন হইয়াছে যে, ইতিহাস তাহাকে কাব্য বলিয়াই পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে। কাব্য বলে, ভাই ইতিহাস, তোমার মধ্যে অনেক মিথ্যা আছে আমার মধ্যেও অনেক সত্য আছে আমরা পূর্ব্বের মত আপস করিয়া থাকি। ইতিহাস বলে, না ভাই, পরস্পরের অংশ বাঁটোয়ারা করিয়া বুঝিয়া লওয়া ভাল। জ্ঞান নামক আমিন সর্ব্বত্রই সেই বাটোয়ারা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। সত্যরাজ্য এবং কল্পনারাজ্যের মধ্যে একটা পরিষ্কার রেখা টানিবার জন্য সে বদ্ধ-পরিকর।

ইতিহাসের ব্যতিক্রম করা অপরাধে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে নালিস উত্থাপিত হইয়াছে তাহাতে বর্ত্তমানকালে সাহিত্য পরিবারের এই গৃহবিচ্ছেদ প্রমাণ হয়।

এ নালিস কেবল আমাদের দেশে নয়; কেবল নবীন বাবু এবং বঙ্কিম বাবু অপরাধী নহেন; ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকদের আদি এবং আদর্শ স্কট্‌ও নিষ্কৃতি পান নাই।

আধুনিক ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফ্রীম্যান্ সাহেবের নাম সুবিখ্যাত। উপন্যাসে ইতিহাসের যে বিকার ঘটে সেটার উপরে তিনি

আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যাহারা য়ুরোপের ধর্ম্মযুদ্ধযাত্রাযুগ (The age of the Crusades) সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন স্কটের আইভান্‌হো পড়িতে বিরত থাকেন।

অবশ্য, য়ুরোপের ধর্ম্মযুদ্ধযাত্রাযুগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানা আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু স্কটের আইভান্‌হোর মধ্যে চিরন্তন মানব-ইতিহাসের যে নিত্য সত্য আছে, তাহাও আমাদের জানা আবশ্যক। এমন কি তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এত বেশি যে, ক্রুজেড্ যুগ সম্বন্ধে ভুল সংবাদ পাইবার আশঙ্কাসত্ত্বেও ছাত্রগণ অধ্যাপক ফ্রীম্যান্‌কে লুকাইয়া আইভ্যান্‌হো পাঠ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবে না।

এখন আলোচ্য এই যে, ইতিহাসের বিশেষ সত্য এবং সাহিত্যের নিত্য সত্য উভয় বাঁচাইয়াই কি স্কট্ আইভ্যান্‌হো লিখিতে পারিতেন না?

পারিতেন কি না সে কথা আমাদের পক্ষে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। দেখিতেছি তিনি সে কাজ করেন নাই।

এমন হইতে পারে, তিনি যে ইচ্ছা করিয়া করেন নাই তাহা নহে। অধ্যাপক ফ্রীম্যান্ ক্রুজেড্ যুগ সম্বন্ধে যতটা জানিতেন স্কট্ ততটা জানিতেন না। স্কটের সময় প্রমাণ বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান এতদূর অগ্রসর হয় নাই।

প্রতিবাদী বলিবেন, যখন লিখিতে বসিয়াছেন তখন ভাল করিয়া জানিয়া লেখাই উচিত ছিল।

কিন্তু এ জানার শেষ হইবে কবে? কবে নিশ্চয় জানিব ক্রুজেড্ সম্বন্ধে সমস্ত প্রমাণ নিঃশেষ হইয়া গেছে! কেমন করিয়া বুঝিব অদ্য যে ঐতিহাসিক সত্য ধ্রুব বলিয়া জানিব, কল্য নূতনাবিষ্কৃত দলিলের জোরে তাহাকে ঐতিহাসিক সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে না?

অদ্যকার প্রচলিত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া যিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবেন, কল্যকার নূতন ইতিহাসবেত্তা তাঁহাকে নিন্দা করিলে কি বলিব?

প্রতিবাদী বলিবেন, সেই জন্যই বলি, উপন্যাস যত ইচ্ছা লেখ কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিও না। এমন কথা আজিও এদেশে কেহ তোলেন নাই বটে, কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যে এ আভাস সম্প্রতি পাওয়া গেছে। স্যর ফ্রান্সিস্ প্যাল্‌গ্রেভ্ বলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন একদিকে ইতিহাসের শত্রু তেমনি অন্যদিকে গল্পেরও মস্ত রিপু। অর্থাৎ উপন্যাস লেখক গল্পের খাতিরে ইতিহাসকে আঘাত করেন, আবার সেই আহত ইতিহাস তাঁহার গল্পকেই নষ্ট করিয়া দেয়,—ইহাতে গল্পবেচারার শ্বশুরকুল পিতৃকুল দুই কূলই মাটি।

এমন বিপদ্ সত্ত্বেও কেন ঐতিহাসিক কাব্য উপন্যাস সাহিত্যে স্থান পায়? আমরা তাহার যে কারণ মনে জানি সেটা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করি।

আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে রসাত্মক কাব্য বলিয়া কাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক সংজ্ঞা আর কোথাও দেখি নাই। অবশ্য, রস কাহাকে বলে সে আর বোঝা-বার জো নাই। যে কোনো ব্যক্তির আস্বাদন শক্তি আছে রস শব্দের ব্যাখ্যা তাহার নিকট অনাবশ্যক; যাহার ঐ শক্তি নাই তাহার এসমস্ত কথা জানিবার কোন প্রয়োজনই নাই।

আমাদের অলঙ্কারে নয়টি মূলরসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকগুলি অনির্ব্বচনীয় মিশ্র রস আছে অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার নাম-করণের চেষ্টা হয় নাই।

* সেই সমস্ত অনির্দ্দিষ্টরসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।

ব্যক্তিবিশেষের সুখ দুঃখ তাহার নিজের পক্ষে কম নহে, জগতের বড় বড় ঘটনা তাহার নিকট ছায়ায় পড়িয়া যায়, এইরূপ ব্যক্তিবিশে-ষের অথবা গুটিকতক জীবনের উত্থানপতন ঘাত প্রতিঘাত উপন্যাসে তেমন করিয়া বর্ণিত হইলে রসের তীব্রতা বাড়িয়া উঠে ; এই রসাবেশ আমাদিগকে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া আক্রমণ করে। আমাদের অধি-কাংশেরই সুখ দুঃখের পরিধি সীমাবদ্ধ ; আমাদের জীবনের তরঙ্গক্ষোভ কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই অবসান হয়। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনীর বিপদ্ সম্পদ্ হর্ষ বিষাদ আমরা আপনার করিয়া বুঝিতে পারি ; কারণ, সে সমস্ত সুখ দুঃখের কেন্দ্রস্থল নগেন্দ্রের পরি-বারমণ্ডলী। নগেন্দ্রকে আমাদের নিকট-প্রতিবেশী বলিয়া মনে করিতে কিছুই বাধে না।

কিন্তু পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখ দুঃখ জগতের বৃহৎব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন, মহা-কালের সুদূর কার্য্যপরম্পরা যে সমুদ্র গর্জ্জনের সহিত উঠিতে পড়িতেছে, সেই মহান্ কলসঙ্গীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে, তখন রুদ্র বীণার একটা তারে মূলরাগিণী বাজে, এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তার গুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর একটা সুদূরবিস্তৃত ঝঙ্কার জাগ্রত করিয়া রাখে।

এই যে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে কালের গতি ইহা আমাদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষগোচর নহে। যদি বা তেমন কোন জাতীয় ইতিহাসস্রষ্টা মহাপুরুষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকেন তথাপি কোন খণ্ড ক্ষুদ্র বর্ত্তমানকালে তিনি এবং সেই বৃহৎ ইতিহাস একসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইতে পারে না। অতএব সুযোগ হইলেও এমন সকল ব্যক্তিকে আমরা কখন ঠিক মত তাঁহাদের যথার্থ প্রতিষ্ঠা ভূমিতে

উপযুক্ত ভাবে দেখিতে পাই নাই। তাঁহাদিগকে কেবল ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া নহে, পরন্তু মহাকালের অঙ্গস্বরূপ দেখিতে হইলে দূরে দাঁড়াইতে হয়, অতীতের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিতে হয়, তাঁহারা যে সুবৃহৎ রঙ্গভূমিতে নায়কস্বরূপ ছিলেন, সেটা সুদ্ধ তাঁহাদিগকে এক করিয়া দেখিতে হয়।

এই যে আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ সুখ দুঃখ হইতে দূরত্ব, আমরা যখন চাকরী করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া খাইয়া দাইয়া কাল কাটাইতেছি তখন, যে, জগতের রাজপথ দিয়া বড় বড় সারথীরা কালরথ চালনা করিয়া লইয়া চলিতেছেন ইহাই অকস্মাৎ ক্ষণকালের জন্য উপলব্ধি করিয়া ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তিলাভ, ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত রসস্বাদ।

এরূপ ব্যাপার আগাগোড়াই কল্পনা হইতে সৃজন করা যায় না যে তাহা নহে। কিন্তু যাহা স্বভাবতই আমাদের হইতে দূরস্থ ; যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্বর্ত্তী তাহাকে কোন একটা ছুতায় খানিকটা প্রকৃত ঘটনার সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিলে পাঠকের প্রত্যয় উৎপাদন লেখকের পক্ষে সহজ হয়। রসের সৃজনটাই উদ্দেশ্য অতএব সেজন্য ঐতিহাসিক উপকরণ যে পরিমাণে যতটুকু সাহায্য করে সে পরিমাণে ততটুকু লইতে কবি কুণ্ঠিত হন না।

শেক্‌স্‌পিয়রের অ্যাণ্টনি এবং ক্লিয়োপাট্রা নাটকের যে মূল ব্যাপারটি, তাহা সংসারের প্রাত্যহিক পরীক্ষিত ও পরিচিত সত্য। অনেক অখ্যাত অজ্ঞাত সুযোগ্য লোক কুহকিনী নারীমায়ার জালে আপন ইহকাল পরকাল বিসর্জ্জন করিয়াছে ; এইরূপ ছোটখাট মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের শোচনীয় ভগ্নাবশেষে সংসারের পথ পরিকীর্ণ।

আমাদের সুপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে কবি একটি সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে

বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন। হৃদ্‌বিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর, প্রেমদ্বন্দ্বের সঙ্গে একবন্ধনের দ্বারা বদ্ধ রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন। ক্লিয়োপাট্রার বিলাসকক্ষে বীণা বাজিতেছে দূরে সমুদ্র তীর হইতে ভৈরবের সংহার শৃঙ্গধ্বনি তাহার সঙ্গে একস্বরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে। আদি এবং করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করিতেই তাহা এমন একটি চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইতিহাসবেত্তা মমসেন্ পণ্ডিত যদি শেক্সপিয়রের এই নাটকের উপরে প্রমাণের তীক্ষ্ণ আলোক নিক্ষেপ করেন তবে সম্ভবতঃ ইহাতে অনেক কালবিরোধ দোষ (anachronism) অনেক ঐতিহাসিক ভ্রম বাহির হইতে পাবে। কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়র পাঠকের মনে যে মোহ উৎপাদন করিয়াছেন, ভ্রান্ত বিকৃত ইতিহাসের দ্বারাও যে একটি ঐতিহাসিক রসের অবতারণা করিয়াছেন তাহা ইতিহাসের নূতন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইবে না।

সেইজন্য আমরা ইতিপূর্ব্বে কোন একটি সমালোচনায় লিখিয়াছিলাম "ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে ধনে হলুদ শর্ষের সন্ধান করেন। মস্‌লা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন্, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোন বিবাদ নাই, কারণ, স্বাদই এস্থলে লক্ষ্য, মস্‌লা উপলক্ষ্য মাত্র।"

অর্থাৎ লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড

করিয়াই রাখুন সেই ঐতিহাসিকরসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল।

তাই বলিয়া কি রামচন্দ্রকে পামর এবং রাবণকে সাধুরূপে চিত্রিত করিলে অপরাধ নাই? অপরাধ আছে। কিন্তু তাহা ইতিহাসের বিরুদ্ধে অপরাধ নহে কাব্যেরই বিরুদ্ধে অপরাধ। সর্ব্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্‌টা করিয়া দাঁড় করাইলে রস ভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাৎ হইয়া ডুবিয়া যায়।

এমন কি যদি কোন ঐতিহাসিক মিথ্যাও সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া বরাবর চলিয়া আসে, ইতিহাস এবং সত্যের পক্ষ লইয়া কাব্য তাহার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলে দোষের হইতে পারে। মনে কর আজ যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, সুরাসক্ত অনাচারী যদুবংশ গ্রীক্‌-জাতীয়; এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন বনবিহারী বংশীবাদক গ্রীসীয় রাখাল; যদি জানা যায় যে তাঁহার বর্ণ জ্যেষ্ঠ বলদেবের বর্ণের ন্যায় শুভ্র ছিল; যদি স্থির হয় নির্ব্বাসিত অর্জ্জুন এসিয়ামাইনরের কোন গ্রীক্‌ রাজ্য হইতে যুনানী রাজকন্যা সুভদ্রাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং দ্বারকা সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন গ্রীক্‌ উপদ্বীপ,—যদি প্রমাণ হয় নির্ব্বা-সনকালে পাণ্ডবগণ বিশেষ রণবিজ্ঞানবেত্তা প্রতিভাশালী গ্রীসীয় বীর কৃষ্ণের সহায়তালাভ করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব বিজাতীয় রাজনীতি, যুদ্ধনৈপুণ্য এবং কর্ম্মপ্রধান ধর্ম্মতত্ত্ব বিস্মিত ভারতবর্ষে তাঁহাকে অবতাররূপে দাঁড় করাইয়াছে তথাপি বেদব্যাসের মহাভারত বিলুপ্ত হইবে না, এবং কোন নবীন কবি সাহসপূর্ব্বক কালাকে গোরা করিতে পারিবেন না।

আমাদের এইগুলি সাধারণ কথা। নবীনবাবু ও বঙ্কিমবাবু তাঁহাদের কাব্যে এবং উপন্যাসে প্রচলিত ইতিহাসের বিরুদ্ধে এতদূর

গিয়াছেন কি না যাহাতে কাব্যরস নষ্ট হইয়াছে তাহা তাঁহাদের গ্রন্থের বিশেষ সমালোচনা স্থলে বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? ইতিহাস পড়িব, না আইভ্যান্‌হো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুই পড়। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়, আনন্দের জন্য আইভ্যান্‌হো পড়। পাছে ভুল শিখি এই সতর্কতায় কাব্যরস হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিলে স্বভাবটা শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া যায়।

কাব্যে যদি ভুল শিখি ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে, সে হতভাগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরও মন্দ।

১৩০৫

কবিজীবনী।

কবি টেনিসনের পুত্র তাঁহার পরলোকগত পিতার চিঠিপত্র ও জীবনী বৃহৎ দুইখণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাচীন কবিদের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জীবনীর সখ্ লোকের ছিল না—তাহা ছাড়া তখন বড় ছোট সকল লোকেই এখনকার চেয়ে অপ্রকাশ্যে বাস করিত। চিঠিপত্র, খবরের কাগজ, সভাসমিতি, সাহিত্যের বাদ-বিরোধ, এমন প্রবল ছিল না। সুতরাং প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনব্যাপারকে নানাদিক্ হইতে প্রতিফলিত দেখিবার সুযোগ তখন ঘটিত না।

অনেক ভ্রমণকারী বড় বড় নদীর উৎস খুঁজিতে দুর্গম স্থানে গিয়াছে। বড় কাব্যনদীর উৎস খুঁজিতেও কৌতূহল হয়। আধুনিক কবির জীবন-

চরিতে এই কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে এমন আশা মনে জন্মে। মনে হয় আধুনিক সমাজে কবির আর লুকাইবার স্থান নাই ;—কাব্য-স্রোতের উৎপত্তি যে শিখরে, সে পর্য্যন্ত রেলগাড়ি চলিতেছে।

সেই আশা করিয়াই পরমাগ্রহে বৃহৎ দুইখণ্ড বই শেষ করা গেল। কিন্তু কবি কোথায়, কাব্যস্রোত কোন্ গুহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা ত খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবন-চরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানবহৃদয়-সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসঙ্গীতের সুরগুলি তাঁহার বাঁশীতে অভ্যাস করিয়া লইলেন ?

কবি কবিতা যেমন করিয়া করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবন কাব্য নহে। যাঁহারা কর্ম্মবীর, তাঁহারা নিজের জীবনকে নিজে সৃজন করেন। কবি যেমন ভাষার বাধার মধ্য হইতে ছন্দকে গাঁথিয়া তোলেন, যেমন সামান্য ভাবকে অসামান্য সুর এবং ছোট কথাকে বড় অর্থ দিয়া থাকেন, তেমনি কর্ম্মবীরগণ সংসারের কঠিন বাধার মধ্যে নিজের জীবনের ছন্দ নির্ম্মাণ করেন, এবং চরিদিকের ক্ষুদ্রতাকে অপূর্ব্ব ক্ষমতাবলে বড় করিয়া লন। তাহারা হাতের কাছে যে কিছু সামান্য মালমসলা পান, তাহা দিয়াই নিজের জীবনকে মহৎ করেন এবং তাহাদিগকেও বৃহৎ করিয়া তোলেন। তাহাদের জীবনের কর্ম্মই তাঁহাদের কাব্য, সেইজন্য তাঁহাদের জীবনী মানুষ ফেলিতে পারে না।

কিন্তু কবির জীবন মানুষের কি কাজে লাগিবে ? তাহাতে স্থায়ী পদার্থ কি আছে ? কবির নামের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে উচ্চে টাঙাইয়া রাখিলে, ক্ষুদ্রকে মহতের সিংহাসনে বসাইয়া লজ্জিত করা হয়। জীবন-চরিত মহাপুরুষের, এবং কাব্য মহাকবির।

কোন ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্ম্মে, উভয়তই নিজের

প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন—কাব্য ও কর্ম্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে। দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে, জীবন এবং কাব্যের মর্য্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।

টেনিসনের জীবন সেরূপ নহে। তাহা সৎলোকের জীবনবটে, কিন্তু তাহা কোন অংশেই প্রশস্ত, বৃহৎ বা বিচিত্রফলশালী নহে। তাহা তাঁহার কাব্যের সহিত সমান ওজন রাখিতে পারে না। বরঞ্চ তাঁহার কাব্যে যে অংশে সঙ্কীর্ণতা আছে, বিশ্বব্যাপকতার অভাব আছে, আধুনিক বিলাতী সভ্যতার দোকানকারখানার সদ্য গন্ধ কিছু অতিমাত্রায় আছে, জীবনীর মধ্যে সেই অংশের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়, কিন্তু যে ভাবে তিনি বিরাট, যে ভাবে তিনি মানুষের সহিত মানুষকে, সৃষ্টির সহিত সৃষ্টিকর্ত্তাকে একটি উদার সঙ্গীতরাজ্যে সমগ্র করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহার সেই বৃহৎ ভাবটি জীবনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই।

আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন কবির জীবনচরিত নাই। আমি সে জন্য চিরকৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি। বাল্মীকিসম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহাকে ইতিহাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু আমাদের মতে তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত। বাল্মীকির পাঠকগণ বাল্মীকির কাব্য হইতে যে জীবনচরিত সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, তাহা বাল্মীকির প্রকৃত জীবনের অপেক্ষা অধিক সত্য। কোন্ আঘাতে বাল্মীকির হৃদয় ভেদ করিয়া কাব্য-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল?—করুণার আঘাতে। রামায়ণ করুণার অশ্রুনির্ঝর। ক্রৌঞ্চবিরহীর শোকার্ত্ত ক্রন্দন রামায়ণকথার মর্ম্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে। রাবণও ব্যাধের মত প্রেমিকযুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে—লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধব্যাপার

উন্মত্ত বিরহীর পাখার ঝট্‌পটি। রাবণ যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল, মৃত্যু বিচ্ছেদের অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। মিলনের পরেও এ বিচ্ছেদের প্রতিকার হইল না।

সুখের আয়োজনটি কেমন সুন্দর হইয়া আসিয়াছিল! পিতার স্নেহ, প্রজাদের প্রীতি, ভ্রাতার প্রণয়—তাহারই মাঝখানে ছিল নবপরিণীত রামসীতার যুগলমিলন। যৌবরাজ্যের অভিষেক এই সুখসম্ভোগকে সম্পূর্ণ এবং মহীয়ান্ করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছিল। ঠিক এমন সময়েই ব্যাধ শর লক্ষ্য করিল—সেই শর বিদ্ধ হইল সীতাহরণকালে। তাহার পরে শেষপর্য্যন্ত বিরহের আর অন্ত রহিল না। দাম্পত্যসুখের নিবিড়তম আরম্ভের সময়েই দাম্পত্যসুখের দারুণতম অবসান।

ক্রৌঞ্চমিথুনের গল্পটি রামায়ণের মূল ভাবটির সংক্ষিপ্ত রূপক। স্থূল কথা এই, লোকে এই সত্যটুকু নিঃসন্দেহ আবিষ্কার করিয়াছে যে, মহাকবির নির্ম্মল অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃপ্রবাহ করুণার উত্তাপেই বিগলিত হইয়া স্যন্দমান হইয়াছে,—অকালে দাম্পত্যপ্রেমের চিরবিচ্ছেদঘটনই ঋষির করুণার্দ্র কবিত্বকে উন্মথিত করিয়াছে।

আবার, আর একটি গল্প আছে রত্নাকরের কাহিনী। সে আর এক ভাবের কথা। রামায়ণের কাব্যপ্রকৃতির আর এক দিকের সমালোচনা। এই গল্প রামায়ণের রামচরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে। এই গল্পে বলিতেছে, রামসীতার বিচ্ছেদদুঃখের অপরিসীম করুণাই যে রামায়ণের প্রধান অবলম্বন, তাহা নহে, রামচরিত্রের প্রতি ভক্তিই ইহার মূল। দস্যুকে কবি করিয়া তুলিয়াছে, রামের এমন চরিত্র,—ভক্তির এমন প্রবলতা! রামায়ণের রাম যে ভারতবর্ষের চক্ষে কত বড় হইয়া দেখা দিয়াছেন, এই গল্পে যেন তাহা মাপিয়া দিতেছে।

এই দুটি গল্পেই বলিতেছে, প্রতিদিনের কথাবার্ত্তা, চিঠিপত্র, দেখা-সাক্ষাৎ, কাজকর্ম্ম, শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কবিত্বের মূল নাই—তাহার মূলে

একটি বৃহৎ আবেগের সঞ্চার, যেন একটি আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবের মত—তাহা কবির আয়ত্তের অতীত। কবিকঙ্কণ যে কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহাও স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া,—দেবীর প্রভাবে।

কালিদাসের সম্বন্ধে যে গল্প আছে, তাহাও এইরূপ। তিনি মূর্খ, অরসিক, ও বিদুষী স্ত্রীর পরিহাসভাজন ছিলেন। অকস্মাৎ দৈবপ্রভাবে তিনি কবিত্বরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। বাল্মীকি নিষ্ঠুর দস্যু ছিলেন, এবং কালিদাস অরসিক মূর্খ ছিলেন, এই উভয়ের একই তাৎপর্য্য। বাল্মীকির রচনায় দয়াপূর্ণ পবিত্রতা এবং কালিদাসের রচনায় রসপূর্ণ বৈদগ্ধ্যের অদ্ভুত অলৌকিকতা প্রকাশ করিবার জন্য ইহা চেষ্টামাত্র।

এই গল্পগুলি জনগণ কবির জীবন হইতে সংগ্রহ করে নাই, তাঁহার কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। কবির জীবন হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া যাইতে পারিত, কবির কাব্যের সহিত তাহার কোন গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না। বাল্মীকির প্রাত্যহিক কথাবার্ত্তাকাজকর্ম্ম কখনই তাঁহার রামায়ণের সহিত তুলনীয় হইতে পারিত না, কারণ সেই সকল ব্যাপার সাময়িক, অনিত্য;—রামায়ণ তাঁহার অন্তর্গত নিত্যপ্রকৃতির—সমগ্র প্রকৃতির সৃষ্টি, তাহা একটি অনির্ব্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ—তাহা অন্যান্য কাজকর্ম্মের মত ক্ষণিক-বিক্ষোভ-জনিত নহে।

টেনিসনের কাব্যগত জীবনচরিত একটি লেখা যাইতে পারে—বাস্তব-জীবনের পক্ষে তাহা অমূলক, কিন্তু কাব্যজীবনের পক্ষে তাহা সমূলক। কল্পনার সাহায্য ব্যতীত তাহাকে সত্য করা যাইতে পারে না। তাহাতে লেডি শ্যালট্ ও রাজা আর্থরের কালের সহিত ভিক্টোরিয়ার কালের অদ্ভুতরকম মিশ্রণ থাকিবে;—তাহাতে মার্লিনের যাদু এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কার একত্র হইবে। বর্ত্তমান যুগ বিমাতার ন্যায় তাঁহাকে বাল্যকালে কল্পনারণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিল—সেখানে প্রাচীনকালের

ভগ্নদুর্গের মধ্যে একাকী বাস করিয়া কেমন করিয়া আলাদিনের প্রদীপটি পাইয়াছিলেন, কেমন করিয়া রাজকন্যার সহিত তাঁহার মিলন হইল—কেমন করিয়া প্রাচীনকালের ধনসম্পদ্ বহন করিয়া তিনি বর্ত্তমান কালের মধ্যে রাজবেশে বাহির হইলেন, সেই সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা লেখা হয় নাই। যদি হইত, তবে একজনের সহিত আর একজনের লেখার ঐক্য থাকিত না,—টেনিসনের জীবন ভিন্ন ভিন্ন কালে ও ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে নূতন নূতন রূপ ধারণ করিত।

১৩০৮